রূপ-মঞ্চ

সম্পাদক
কালীশ মুখোপাধ্যায়

KAMALA ENGINEERING WORKS
KEW
SPECIALISTS IN PUNCHING PRESS & SHEET METAL DIES
14 HALSI BAGAN ROAD • CALCUTTA •
PHONE
BB538

The University of Chicago Library

—পৃষ্ঠপোষকতায়—

নিতাই চরণ সেন
প্রভাসচন্দ্র মিত্র
এস্, কে, রায়
কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ
বিভূতি দত্ত
এইচ্, বোর্ণ

—সম্পাদনায়—

কালীশ মুখোপাধ্যায়
অমূল্য মুখোপাধ্যায়
জগৎজ্যোতি সরকার
গোপাল ভৌমিক
সুখেন্দু সেনগুপ্ত
ডাঃ বিমল বসু
শ্রী প ঞ্চ ক
ই উ সু ফ

—রেখাঙ্কনে—

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাহক হ'তে হলে ঃ
বার্ষিক সডাক ৬৲ টাকা
ষান্মাসিক সডাক ৩৷৷০ টাকা
প্রতি সংখ্যা আট আনা
মনিঅর্ডারযোগে টাকা প্রেরিতব্য।

*

অজয় স্মৃতি সংখ্যা ঃ মূল্য এক টাকা

রূপ-মঞ্চ
মঞ্চ, পর্দা ও সাহিত্যকলার সচিত্র মাসিক
বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির মুখপত্র
কার্যালয় ৩০, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা

১২শ সংখ্যা ঃ পৌষ ১৩৫০ ঃ তৃতীয় বর্ষ

আমাদের আজকের কথা

অজয় ভট্টাচার্য

অজয় ভট্টাচর্য মারা গেছেন। প্রথম যখন শুনলুম, কথাটা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারিনি। শুনলুম এম, পি প্রোডাকসন্সের এক বন্ধুর কাছে। ২৫শে ডিসেম্বর। বেলা প্রায় ১০টা। রূপবাণীর কাছাকাছি—যেতে হবে আমায় গে স্ট্রীটে। বন্ধুবর বল্লেন ঃ আমিও বিশ্বাস করতে পাচ্ছিনা—আপনি রূপবাণী থেকে সঠিক সংবাদ জেনে যান।' এলাম রূপবাণীতে, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পালকে ঘিরে একরাশ লোক। আমি আসবার পূর্বেই তাঁরা সংবাদ পেয়েছেন অথচ তাকে সত্য বলে কেউই গ্রহণ করতে পারছেন না। আর এক জন এলেন একটু বাদে। তিনি বল্লেন ঃ হ্যাঁ, গতকাল রাত ৮৷৷০ টায় অজয় বাবু মারা গেছেন।'

প্রেসে এসে ডি, লুক্স পিকচার্সে টেলিফোন করলুম, বেলা ১১টা, হারুদা তখনও অফিসে আসেননি। সংবাদটা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারলুম না—তিন চার দিন পূর্বে ধর্মতলায় দেখা অজয় বাবুর সংগে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ছদ্মবেশীর মুক্তি দেবেন কবে?' তিনি রসিকতা

করে বল্লেন : বোমার ভয়ে ছদ্মবেশী মুক্তি পেল না—অথচ বোমার ঘায়েই পরিচালক অক্কা পেয়ে না যায়—!' সুস্থ শরীরে তাঁর সেই কথোপকথন আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। আজ তাঁর মৃত্যু বিশ্বাসই বা করি কেমন করে? আবার টেলিফোন করলুম হারুদার কাছে—। তিনি ধরলেন। ডাকলাম : হারুদা! : হ্যাঁ—

গলার স্বর তাঁর ভারাক্রান্ত। আবার ডাকলাম : হারুদা—তখনও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হচ্ছে না।

: হারুদা। অজয় বাবু কী—।' হারুদা বুঝলেন আমি কী বলতে চাই। কিন্তু তিনিও স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। তাই উত্তর দিলেন : হ্যাঁ যা জানতে চাইছো ঠিক। সব শেষ করে এসেছি।'

টেলিফোন নামিয়ে নিজের ঘরে এসে বসলাম। বড়দিন সংখ্যা রূপ-মঞ্চ ২।১ দিন বাদেই বেরোবে। সহকর্মীরা তাই নিয়েই ব্যস্ত। সংবাদটা তাঁদের কাছেও বজ্রপাতের মতই আঘাত করলো। বল্লাম : কাগজ ২।৩ দিন বাদেই বেরোবে। আমি ডোভার লেনে যাচ্ছি।'

ট্রাম থেকে নেমে ডোভার লেন অবধি এলাম। বাড়ীটার কাছাকাছি এসে পা চলতে চায় না—ভিতরে পা দেবার কথা দূরে থাক—সহজ ভাবে মুখ তুলে বাড়ীটার দিকে তাকাবার মত সহজতাও আমার ভিতর খুঁজে পেলাম না। যে বাড়ীর—যে ঘরে বসে তাঁর সংগে কত আলাপ-আলোচনা চলেছে—আজকে সে ঘরে—তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের মাঝে নিজেকে কোনমতেই ঠেলে নিয়ে যেতে পারলুম না। নিঃশব্দে, অতি সন্তর্পণে—যেন কেউ দেখতে না পায়, বাড়ীটা ডিঙ্গিয়ে চলে এলাম।

পূর্ব্বাশায় এলাম। সঞ্জয় বাবুকে দেখলাম। অজয় বাবুর কয়েকজন সহকর্মী—এবং পূর্ব্বাশার কর্মীবৃন্দ সঞ্জয় বাবুকে ঘিরে বসে আছেন। কারোর মুখে কোন কথা নেই। মর্মান্তিক বিষাদের ছায়া সেখানকার বাতাসকে ভারি করে তুলেছে। নিজেকে সংযত করার ব্যর্থ চেষ্টায় সঞ্জয় বাবু অস্ফুট স্বরে বল্লেন : বসুন।' কর্তব্যপরায়ণতায়—সহনশীলতায় মায়ের মৃত্যুকে যিনি সহাস্যেই বরণ করেছেন, আজ শোকে তিনি মুহ্যমান—ভ্রাতৃশোকের কাছে নিজের সমস্ত শক্তি যেন ফুৎকারে ভেসে গেছে—ভিতরের কান্না গুমরে গুমরে উপছে পড়ছে—বাইরে তাকে আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখবার তাঁর ব্যর্থ চেষ্টা আরো আমায় ব্যথিত করে তুললো। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার মত কিছুক্ষণের জন্য কোন শক্তিই আমার মাঝে খুঁজে পেলাম না।

নীরস কর্তব্য। বললাম : আগামী সংখ্যা রূপ-মঞ্চ অজয়ের স্মৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে—আপনার অনুমতি ও সহযোগীতার একান্ত প্রয়োজন।' এই শোকের মাঝেও তিনি রূপ-মঞ্চের প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করে তুলবার সর্ব্ব প্রকার সহযোগীতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি চলে এলাম।

একা ঘরে টেবিলের সামনে বসে—গীতিকারের স্মৃতি জড়িত দিনগুলি আমায় আচ্ছন্ন করে ফেল্‌লো। কতবার এই ঘরে হাসি-গল্পে তিনি আমাদের মাতিয়ে তুলেছেন। সেদিনও—বেশীদিন আগেকার কথা নয়—শারদীয়ার পর—বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির এক সভা। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজয়বাবুর বলবার কথা। প্রতি মাসেই এরূপ কাউকে আমন্ত্রণ করে এনে আলোচনা করবার পরিকল্পনা আমাদের ছিল, আছেও। কিন্তু এর আগ পর্যন্ত চিত্র জগতের যত মহারথীকেই কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রণ করেছি—তাঁরা কেউই দয়া করে কথা রাখতে পারেননি। তবুও আবার চিত্র জগতেরই আর একজনকে নির্বাচন করা হলো। সন্ধ্যা ছটায় ছিল সেদিন আলোচনা হবার কথা। সভ্যরা এবং বাইরেরও অনেকেই ওদিন উপস্থিত ছিলেন—৬টার পূর্ব্ব থেকেই উদ্বিগ্নের মাত্রাটা বৃদ্ধি পেতে লাগলো—অজয়বাবু তখন

অবধিও আসছেন না। আমার পর এক এক করে বাক্যবান বর্ষিত হতে লাগলো। কেউ বলতে লাগলেন : বারবার আপনাকে বলি—তবু আবার ওদের নিয়ে টানা-টানি করেন কেন? ওদের কী কোন কথার মূল্য আছে?' আমি উত্তর দিলাম : টানাটানি করে যত দিন না তাল মত ফেলতে পারবো—ততদিন পর্যন্ত টানাটানি করতে হবেই।'

৬টা বেজেও কয়েক মিনিট হয়েছে। চারিদিক থেকে বর্ষণের ধারাটাও বৃদ্ধি পেল। আমিও একটু দমে পড়লাম। পরপর এমনি ব্যর্থতা! তবু নিজেকে সংযত করে বল্লাম : হয়েছে কী? উপস্থিত কাউকে সভাপতি করে, আমরাই আলোচনা চালাতে থাকি।" অজয়বাবু এলেন না—অজয়বাবু আসবেন না—অজয়বাবুর আশা তখন সকলেই ছেড়ে দিয়েছেন। আসরটা একটু ঢিমে হয়ে এলো—উৎসাহ এলো কমে। চা দিয়ে তাকে গরম করে নেবার চেষ্টা করলুম আমরা। চায়ের কাপে যার যার চুমুক দিয়েছি— : কৈ কালীশ বাবু দরজা খুলুন" সদর দরজা ছেড়ে আর এক দরজায় ঘা মারলেন অজয়বাবু। তাঁর সে ঘায়ে সভ্যদের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল। চায়ের কাপ টেবিলের পরই রইল—দরজা খুলে অজয়বাবুকে নিয়ে এলাম। অপরের কথা ছেড়েই দিলুম—আমার আশা উৎসাহ তখন যা ফিরে এলো তা অপরিমেয়। আজ তা এতদিনের ব্যবধানে ভাষায় ফুটিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টাই হবে। অজয়বাবু দাড়িয়ে সকলকে নমস্কার করে বললেন : দেরী হয়ে গেল, ক্ষমা করবেন।" আমি বল্লাম : আপনার আশাত আমরা ছেড়েই দিয়েছিলাম। সকলের উৎসাহও থেমে এসেছে।' অজয়বাবু অপরাধীর সুরে বল্লেন : বাড়ীর সব মেয়েরা ছটার শোতে ছবি দেখতে গেল—তাঁদের পৌঁছে দিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেছে।' অজয়বাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সকলে জবাব দিলেন এক সংগে : না-না—তাতে কী হ'য়েছে! আপনি বসুন চা খেয়ে নিন, তারপর আলোচনা আরম্ভ করা যাবে।' আমি মুচকী তখন হাসছি। অজয়বাবু বা এদের সম্পর্কে কারোর সে কোন প্রকার অভিযোগ আছে বা ছিল—সে চিহ্ন সকলের মুখ থেকেই মুছে গেছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা চিত্র জগতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন এবং নিজের অভিজ্ঞাতায় তার সমাধানের উপায়ও বাতলে যেতে লাগলেন। উপস্থিত সভ্যরা এক এক করে নানান প্রশ্ন তুলে অজয়বাবুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবার উপক্রম করলেন : অবিচলিত এবং ধৈর্যহীন ভাবে তিনি যথাযথ উত্তর দিয়ে গেলেন।

'বাংলা চিত্র জগতে নূতন মুখ দেখা যায় না কেন—হিন্দি ছবির তুলনায় আমাদের অভিনেত্রী-সম্পদই বা এত কম কেন?' এর উত্তরে অজয়বাবু বল্লেন : এজন্য আমাদের সমাজের গোড়ামীই মূলতঃ দায়ী হলেও—সাধারণতঃ এতদিন যে সমাজ থেকে অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়ে আসছে সে সমাজের জীবনযাত্রা প্রণালীকেও অবহেলা করা চলে না এই সমাজ থেকে—কিরূপ প্রতিভাশালী অভিনেত্রীই বা আমরা আশা করতে পারি? কতটুকুই বা এদের দেবার থাকতে পারে? বাংলা চলচ্চিত্রের জন্মের সংগে যে লজ্জার ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সে ইতিহাস এখনও আমরা চাপা দিতে পারিনি। আমাদের চলচ্চিত্রের জন্মের সংগে যে বিলাস-প্রিয়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে তারই হাত ছানিতে আমাদের ধনিক সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ এদিকে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। তাঁদের সেই দুর্বলতার জন্য আজ পর্যন্তও চলচ্চিত্রকে আমরা সামাজিক মর্যাদা দিতে পারলুম না। যেদিন নিছক ব্যবসা ও শিল্পের মোহেই, আমাদের ধনীকেরা চলচ্চিত্রকে পুরোপুরী গ্রহণ করতে পারবেন—সেদিনই এর সামাজিক মর্যাদা দেওয়া যাবে। সেদিন সমাজের বিভিন্নস্তর থেকে আমরা অভিনেত্রী সংগ্রহ করতে পারবো—ভদ্রও শিক্ষিত সমাজের

মেয়েরা 'প্রফেসন' হিসাবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করতে আর ভয় করবেন না। বম্বের চলচ্চিত্র শিল্পের মূলে—শিল্পের দৃষ্টি ভংগী না থাকলেও, তার পেছনে রয়েছেন বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ী, যাঁরা নিছক ব্যবসার দিক থেকেই একে গ্রহণ করেছেন—তাই সেখানে অভিনেত্রী সমস্যা আমাদের এখানকার তুলনায় অনেক কম। চলচ্চিত্র সেখানে সামাজিক মর্যাদা পেয়েছে। চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীরা আর সমাজের অপৃশ্যা নন—সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁদের যথেষ্ট সম্মান রয়েছে।

আমাদের এখানে পুরোপুরী না হ'লেও চৌদ্দ আনা ব্যবসায়ের দিক বলে গৃহীত হ'য়েছে। শিল্পের মর্যাদা এখনও সে পায়নি। যদিও চলচ্চিত্রকে শিল্পের মর্যাদা সর্বপ্রথম যদি কেউ দিয়ে থাকে তা সে বাঙ্গালীই। জাতীয় শিল্প বলে চলচ্চিত্রকে মর্যাদা দানের সংগে নিউথিয়েটার্সের নাম সর্বাগ্রে জড়িত থাকবে। হাতী-মার্কা ছবি এখনও বাংলার বাইরে যা মর্যাদা পায় ভারতের কোন প্রতিষ্ঠান আজ অবধিও তার সমকক্ষতার দাবী নিয়ে দাড়াতে পারেনি এজন্য শ্রীযুক্ত বি, এন সরকারের কাছে বাঙ্গালী চিরদিন ঋণী থাকবে।"

হিন্দি ও বাংলা ছবির তুলনা করতে যেয়ে অজয়বাবু বলেন: যারা বলবেন বাংলা ছবি তুলনায় নিকৃষ্ট—তাদের কথা মোটেই আমি স্বীকার করবো না। 'এভারেজ' কসলে বাংলা ছবি হিন্দির তুলনায় এখনও অনেক উচ্চে। বাংলার দেবকী বোস, নীতীন বোস, প্রমথেশ বড়ুয়া, শৈলজানন্দ এদের সমকক্ষ পরিচালক অন্যান্য প্রদেশে ক'জন আছেন?"

সমালোচনার কথা উল্লেখ করতেই তিনি বলেন: নিরপেক্ষ সমালোচনাই আমি চাই এ বিষয়ে—(আমাকে দেখিয়ে তিনি বল্লেন) কালীশবাবু সাক্ষী।'

আমার মনে আছে: অশোকের সমালোচনা নিয়ে রূপ-মঞ্চ আত্মপ্রকাশ করেছে। এসপ্লানেডের মোড়ে একটা বই হাতে করে নিয়ে অজয়বাবুকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে আমি আস্তে আস্তে তাঁর পাশে যেয়ে দাড়ালুম। দেখি: রূপ-মঞ্চ খুলে এক মনে তিনি অশোকের সমালোচনা পড়ছেন। শেষ করে পাশ ফিরতেই আমায় দেখে: আরে—আপনি যে—কী বলবো, আপনাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। এই ত প্রকৃত বন্ধুর কাজ। এমনি Details-এ আর কোন কাগজ যায়নি। আমার বন্ধুত্ব একটুকুও আপনার পর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—খাটি সমালোচকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো।' আত্মশ্লাঘার জন্য এখানে একথা আমি উল্লেখ করি নি নিরপেক্ষ সমালোচনা অজয়বাবু কিরূপ ভালবাসতেন—সেই কথাই আমি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কারণ নিকট বন্ধু হ'য়েও অশোক চিত্রের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করতে আমরা দ্বিধা করিনি এবং তাতে তিনি রুষ্ট না হ'য়ে আনন্দিতই হ'য়েছিলেন বেশী।

সমালোচনা-প্রশংসা রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে ওদিন রূপ-মঞ্চকে যে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে গেছেন তার অবর্তমানে তাঁরই দেওয়া মর্যাদায় রূপ-মঞ্চ চলার পথে অনেক সান্ত্বনা পাবে। তিনি বলেন: এমনি কাগজের অভাব ছিল—যারা চলচ্চিত্র ও সমাজের মাঝে সেতু তৈরী করতে পারবে। রূপ-মঞ্চের কর্মীরা উপস্থিত আছেন বলেই নয়—রূপ-মঞ্চের শ্রীপার্থিবের দপ্তর—ষ্টুডিও সংবাদ সরবরাহের কায়দা—নিরপেক্ষ সমালোচনা চিরদিন বাংলা চলচ্চিত্র জগত মনে রাখবে।"

আরো অনেক আলোচনা সেদিন হ'য়েছিল। দু'ঘণ্টা আলোচনায় তিনি প্রায় ২৫।৩০ জন লোকের হৃদয় সকলের অজানা জয় করে নিয়ে গেলেন—তাই তাঁর মৃত্যুতে বলতে হয়—"He came to win অথবা He came and won" ওদিনকার সভ্যদের অনেকেই এসে আজ আমার

অজয় ভট্টাচার্য

ছদ্মবেশী চিত্র সম্পর্কে কয়েকটী কথা জানেন কী?

- এর পরিচালক বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গীতিকার ছিলেন।
- **ছদ্মবেশী** তাঁর শেষ ছবি। পরিচালকরূপে ছদ্মবেশীতে তাঁর প্রতিভা ফুটে উঠেছে।
- **ছদ্মবেশী চিত্রের** হাসির হল্লার মাঝে প্রতারক মানুষের বিরুদ্ধে তিনি যে সব অভিযোগ এবং প্রতারিত মানুষের মর্মবেদনার যে কথা ফুটিয়ে তুলেছেন—তা দেখে পরিচালকের অন্তরের সত্যিকারের দরদের সন্ধান পাওয়া যায়।
- **ছদ্মবেশী চিত্রে** পরিচালকের সৃষ্ট একটী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চরিত্রে অভিনয় করে ছবি বিশ্বাস যে কোন বৈদেশিক অভিনেতার প্রতিভাকেও হার মানিয়েছেন বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না।
- জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দু মুখার্জি, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা, শৈলেন চৌধুরী, প্রত্যেকেই আপনাদের প্রশংসা পাবেই।
- **ছদ্মবেশীর** প্রারম্ভে পরিচালকের পরিকল্পনা সুর শিল্পী শ্রীযুক্ত শচীনদেব এমনি মূর্ত করে তুলেছেন—যা আজ পর্যন্ত কোন বাংলা ছবিতে দেখা যায়নি।
- **ছদ্মবেশীর** উদ্বোধন দিবসে ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের সভাপতিত্বে পরিচালকের স্মৃতি উদ্দেশ্যে যে সভা হয় তাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বাংলার শিল্পী ও সুধী সমাজ থেকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, ছদ্মবেশী চিত্র দেখে তাঁরা সকলেই তৃপ্ত হয়েছেন।
- নিরপেক্ষ পত্র-পত্রিকা গুলি বিনা দ্বিধায় ছদ্মবেশীর প্রশংসা করেছেন।
- **ছদ্মবেশী চিত্রের** সংগে এর পরিচালকের স্মৃতি জড়িয়ে আছে
- **ছদ্মবেশী চিত্র** দেখে আপনিও এর প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটন করুন।
- **ছদ্মবেশীর** পরলোকগত পরিচালকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটী সমালোচনা-প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে—স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক দর্শকেরই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার অধিকার আছে। গীতিকার-পরিচালক অজয় ভট্টাচার্যের কথা আলোচনা করে (রূপ-মঞ্চের অজয় স্মৃতি-সংখ্যা এ বিষয়ে সাহায্য করবে) ছদ্মবেশী চিত্রের সমালোচনা করতে হবে। সমালোচনা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হবে এবং বিচারক মণ্ডলীর বিচারে উপযুক্ত সমালোচককে নগদ ১৫৲ টাকা অথবা ১৫৲ টাকার মূল্যের পারিতোষিক দেওয়া হবে।

সম্পাদক রূপ-মঞ্চ সমালোচনা-প্রতিযোগিতা বিভাগ অথবা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রচার সচিব রীতেন এণ্ড কোং, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় ৩০ই মার্চের ভিতর সমালোচনা পৌছানো চাই————।

বিচারকমণ্ডলী

ভাষাচার্য—সুনীতি কুমার, নট সূর্য—অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস (শনিবারের চিঠি), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বেতার), শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র (এম, পি), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক (আনন্দ বাজার), শ্রীযুক্ত নির্মল ঘোষ (অমৃত বাজার), চন্দ্রশেখর (দীপালী), পারবার (সিনেমা টাইমস), [illegible] (দিলীপ আচার্য), [illegible] (প্রেস এণ্ড পিপল), [illegible] পাধ্যায় (ভারতবর্ষ), এস, বাসুভে (বি, এফ, ও), কমল দাশ (সুর শিল্পী), নীলিমা দেবী, অ[illegible]পোপাধ্যায়, শ্রীপঞ্চক (রূপ-মঞ্চ), [illegible] নাথ সাহা (প্রাইমা), অখিল নিয়োগী (ওরিয়েন্ট), [illegible] রহমান, [illegible], [illegible] কে, সিরাজউদ্দিন, কালিদাস ঘোষ, এবং আরও তিনজনকে নিয়ে বিচারক-মণ্ডলী গঠিত হবে

"তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছানো পথে
নিয়ে গেছ হায় একটী কুসুম
আমার কবরী হ'তে।
নিয়ে গেছ হিয়া কি নামে ডাকিয়া
নয়নে নয়ন দিয়া।
আমি যেন হায় ফেলে-যাওয়া-মালা
কূলহারা নদী স্রোতে।
খেলাঘরে কবে ধূলির খেলায়
দুটি হিয়া ছিল বাঁধা,
আমার বীণাটি তোমার বাঁশীটি
এক সুরে ছিল সাধা।
সে খেলা ফুরালো সে সুর মিলালো
নিভিল কণক আলো,
[illegible]য়ে গেছ মোরে শত পরাজয়
ফিরে এসো জয় রথে॥"

*

স্ত্রী রেণুকা দেবী
অজয় স্মৃতি-সংখ্যা

ওরে মোর দুরন্ত অস্থির,
তোর মনে বাঁধিয়াছে নীড়
সে কোন্ ঝড়ের পাখী ?
কোন্ শক্তি দিয়া আমি তারে বেঁধে রাখি।
চরণের ছন্দে তোর জাগিছে প্রলয়
আমার পৃথিবী তুই করেছিস জয়।
অদেহী অনন্ত ভালবাসা মম
ফাল্গুনের সমীরণ-সম
তোরেই খুঁজেছে বুঝি নিত্যকাল ধ'রে
তাই মোর কল্পছায়া এসেছিস কায়া ধরি'
আমার মাটীর ঘরে।
সুন্দরের শিশু-দূত মোর
তোর লাগি খুলিয়া দিয়েছি এই
হৃদয়ের দোর।

"বাবা"
১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৩

শ্রীমান অঞ্জুর জন্মোৎবে আশীর্ব্বাদ

ওরে মোর শিশু-কবি,
আপনার মনে এঁকে যাস্ কোন্ ছবি
সুচঞ্চল কল্পনার বামধনুর রং দিয়া ?
হানিয়া যুগল ভুরু আকাশের পানে
অর্থ-হীন গানে
কাহারে ডাকিস তুই, খুঁজিস কাহারে ?
চাঁদ-তারকার দেশে আছে বুঝি খেলার সাথিটী
মায়া-নদীপারে !
চির-শিশু ডালিম কুমার তোর বুকে রয়েছে জাগিয়া,
তাই বুঝি স্বপ্নে তুই পক্ষীরাজ নিয়া
উড়ে যাস তেপান্তর পার হ'য়ে
তোর চেয়ে ছোট এক রাজ-কন্যা ল'য়ে।
ঘুমে তোরে চুমু খায় পরীদল আসি'
তাই বুঝি জাগে তোর যাদুমাখা হাসি !

শিশু-পুত্র ও কন্যা শ্রীমান অঞ্জু ও রুমুরাণীর জন্মতিথিতে অজয় বাবু এই কবিতা দুটী বিশেষ ভাবে লিখে উপহার দিয়েছিলেন। পুত্র-কন্যার জন্মতিথিতে কবি পিতার এইত শ্রেষ্ঠ উপহার !

রুমুরাণীর জন্মতিথি

ঝিনুক-পুরীর রাজকন্যা
আমার ঘরে দেখি
লক্ষ চাঁদের একটি যে বোন
নেমে এলো সে কি ?
একটি ঝলক ফুলের হাসি
কেমন করে এলো ভাসি'—
নীল পাহাড়ের ঘুম ভাঙ্গানো
নির্ঝরিণী একি !
ছোট্ট হাতে শক্তি কত
বাঁধন ছাড়া দায়,
আধো কথায় কথার-সাগর
উছলে বুঝি যায়
ঐ চোখে তার আকাশ দোলে
তাইতো আমার ভুবন ভোলে
আমার হিয়া বাঁধলো বাসা
ঐটুকু হিয়ায়।

কবিতা দু'টীর পাশে ওদের ঐ বয়সের ছবি তুলে বাঁধিয়ে উপহার দিয়েছিলেন। অজয় বাবুর বেঁচে থাকা কালীন একাধিকবার কবি পিতাকে প্রশংসা করেছি, আজ তাঁর মৃত্যুতে—পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরবার জন্যই—এদু'টী প্রকাশ করলুম।

ওরে আমার সোণার পুতুল
তোর সাথে মো'র খেলা
তোরে ল'য়ে স্বপন বোনা
চলুক সারা বেলা
কঠিন আমার দিনগুলিরে
কোমল ছোঁওয়ায় যাই ভুলিরে
এঘর আমার হোক খেলাঘর
সুখের চির মেলা।
ছোট্ট কুঁড়ি ফুল হবে অই
বাড়বে শিশু চাঁদ
আমার রুমু রুমু-ই র'বে
সেই তো আমার সাধ
মিষ্টি মধুর 'আড়ি' দেওয়া
অমি হাজার চুমু নেওয়া
আমায় ঘিরে চিরদিনই
গড়বে মায়া-ফাঁদ
সেইতো আমার সাধ—

ইতি—
আশীর্বাদক
'বাবা'

১লা মার্চ
১৯৪১

সৌন্দর্যের পরিকল্পনা

নারীর সৌন্দর্য ও লাবণ্যকে আশ্রয় করেই একদিন প্রাচীন ভারতীয় সৌন্দর্যের চরম অভিব্যক্তি হয়েছিলো। তেমনি পারিবারিক জীবনেও, বিশেষ করে উৎসবের দিনে, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে চা-পরিবেশনের আনন্দমুখর অনুষ্ঠানের ভিতর নারীর আন্তরিক মাধুর্যের এক অনবদ্য রূপ আমরা দেখতে পাই। আতিথেয়তায় ভারতের যে বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ, চায়ের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই আপনি তাকে জীবন্ত করে তুলুন। ব্রত-পার্বণ কিংবা বিবাহ-জন্মদিন, আপনার বাড়িতে যে উৎসবই হোক না কেন, অভ্যাগতদের চা দিয়েই তৃপ্ত করবেন। কেননা চা-ই আনে আন্তরিকতা; আর আনন্দ-বিনিময় তাকে ঘিরেই হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ-নিখুঁত সে আন্তরিকতার মধ্যেই ভারতীয় আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে ওঠে।

★

"প্রাত্যহিকী" নামক আমাদের সচিত্র পুস্তিকা পড়ে দেখুন প্রাত্যহিক জীবনে চায়ের স্থান কত বড়ো। বিনামূল্যে ও বিনা-মাশুলে এই পুস্তিকা পেয়ে যাবেন, এই বিজ্ঞাপনটি কেটে আপনার নাম ও ঠিকানা বড়ো অক্ষরে লিখে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন. কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপান্‌শান্ বোর্ড, পোঃ বক্স ২১৭২, কলিকাতা।

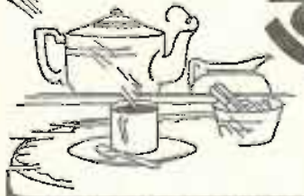

ভারতীয় চা

একমাত্র পারিবারিক পানীয়

ইণ্ডিয়ান্ টী মার্কেট এক্সপ্যান্‌শান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলছেন: কেন—কেনই বা আপনি অজয় ভট্টাচার্যের সংগে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ করিয়ে দিলেন—আজ দু'ঘণ্টার বন্ধুকে কোন মতেই ভুলতে পারছি না তাঁর বিয়োগ ব্যথা—অন্তরের অন্তস্থলে যেয়ে আঘাত করছে।"

অজয়বাবুর সংগে অল্পদিনের পরিচয় হলেও তাঁর চরিত্রের মধুর-আকর্ষণে উভয়ে যেন উভয়কে খুব নিকটে পেয়েছিলাম। গীতিকার ও কবি অজয় ভট্টাচার্যের সংগেই প্রথম আমার পরিচয় ঘটে। তখন মনটা ছিল কাঁচা। চলার পথেও কোন সংঘাত এসে দেখা দেয়নি। কবিতা লিখতাম। খাতার পর খাতা ভরতি করে। আকাশে চাঁদ উঠলে—আঙ্গিনায় হাসনা হেনার হাসি দেখলে—উদ্দীপনা যেন শতগুণে বৃদ্ধি পেতো। তাই যে লেখকের ভিতর হাসনা হেনা আর চাঁদের হাসি থাকতো তিনি সহজেই আমার মাঝে স্থান করে নিতেন। তখন কবিতার মর্মার্থ বুঝে আকৃষ্ট হতাম না—যতটা না হতাম—বাইরের স্বপ্নবিলাসী ভাবালুতা ও শব্দ বিন্যাসের চতুরতায়। একথা আজ আর বলতে লজ্জা বোধ করি না। রবীন্দ্রনাথও এমনি করে আমার মাঝে স্থান করে নিয়েছিলেন প্রথমে। অজয় ভট্টাচার্যের বেলায়ও সেই কথাই খাটে। পরবর্তী কালে বাস্তবের সংগে যখন সংঘাত এলো—কোথায় গেল আকাশের চাঁদ আর আঙ্গিনার হাসনা হেনা—স্বপ্নবিলাসী ভাব কাটিয়ে তখন একটু বাস্তববাদী হয়ে উঠেছি—পূর্বেকার কবিরা এক এক করে মন থেকে মুছে যেতে লাগলেন—অজয় ভট্টাচার্যও যাবো যাবো করছেন এমনি সময় তাঁর সংগে পরিচয় হলো গীতিকার রূপে। ক্যানিং হোষ্টেলের কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কবির সংগে হলো সাক্ষাৎ পরিচয়। এর পর রেকর্ডে গান বাজলেই অনুসন্ধান করতাম: অজয় ভট্টাচার্যের লেখা কি না! রূপ-মঞ্চের প্রথম সংখ্যা বেরোল। অজয়বাবু লিখলেন। অজয়বাবুর সান্নিধ্যে আসতে লাগলাম। এই সান্নিধ্য—আলাপ পরিচয় এমনি আকর্ষণে বাঁধলো রূপ-মঞ্চের একজন পরম হিতৈষী ছাড়া তাঁকে কোন দিন অন্য কিছু মনে করতে পারিনি। এবার পূজার সময়কার কথা: অজয়বাবুকে লিখতে বলা হ'লো। লেখা পাঠালেন। আমি কোথায় যে লেখাটা হারিয়ে ফেল্‌লাম—তন্ন তন্ন করে খুঁজে ও আর পেলাম না। শারদীয়া সংখ্যা বেরোবার ৬।৭ দিন বাকী। আমি নিজের দোষ স্বীকার করে ২।৩ দিনের ভিতর লেখা দেবার তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখলাম: রাত জেগে হলেও লিখতে হবে।'

২।৩ দিনের ভিতর লেখাটা তিনি লোক মারফতে পাঠিয়ে দিলেন। চলচ্চিত্র জগতের নায়কের চরিত্রকে কেন্দ্র করে তাঁর 'নায়ক' যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠলো—পাঠক পাঠিকারা তার অজস্র প্রশংসা করে পাঠালেন।

কিছুদিন পূর্বে রূপ-মঞ্চের কয়েকজন পাঠক অভিযোগ করে চিঠি লিখলেন: রূপ-মঞ্চ কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থে পুষ্ট এবং সেই প্রতিষ্ঠানটী এম, পি, প্রোডাকসন। তাঁদের এই ধারণা হয়েছে—ছদ্মবেশীর ষ্টুডিও সংবাদ ওরূপ সুষ্ঠু এবং অভিনব ভাবে আমরা পরিবেশন করে ছিলুম বলে।

চলার পথে নানান বাধা বিঘ্নে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি—সত্যিকারের আন্তরিকতার কোন দাম নেই—এমনি হতাশায় মুহ্যমান। অজয়বাবুর সংগে কথায় কথায় বল্লাম: এই ত দেখুন না, কয়েকজন পাঠক চিঠি লিখেছেন, আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অর্থে পুষ্ট—অথচ আপনি জানেন—ব্যবসার দিক থেকেও আপনাদের প্রতিষ্ঠান বোধ হয় আমাদের সবচেয়ে কম সাহায্য করেন।' সেদিন আমার এই হতাশায় যে বন্ধুটীর মনে সবচেয়ে বেশী আঘাত লেগেছিল—সে বন্ধুটী আর কেউ নন, অজয় ভট্টাচার্যই। আমার হাত ধরে একটা ঝাকুনি দিয়ে বল্লেন: ঘাবরাই

য়ে মাৎ, চলার পথে যেমনি আসবে অভিনন্দন—তেমনি আসবে—ব্যর্থতা। এজন্য দমলে চলবে কেন?' তারপর বাংলার কোন জনপ্রিয় নেতার কথা উল্লেখ করে নিজের জনপ্রিয় একটী সংগীত থেকে আওড়িয়ে গেলেন ঃ

"বেদনার অশ্রু যে বেদনার গাহে জয়।
ঝঞ্ঝার পাশে ওই
কল্যাণ আসে ওই,
হলাহল পাত্র যে সুধারসে টলমল।"

'যারা আজ হানবে বজ্র। তারাই একদিন দেবে জয়মাল্য যারা আজ ভুল বুঝবে—তাদের ভুল একদিন ভাঙবেই।'

জানি না তাদের এ ভুল ভাঙ্গাতে পারবো কিনা।—কিন্তু অমনি যদি আঘাতে আবার মন ভেঙ্গে পড়ে—নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখতে না পারি—তবে কোন বন্ধু, সে ক্লান্তি ও অবসাদের সময় ঝাকুনি দিয়ে আমায় উৎসাহিত করে তুলবেন কি না?

'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের কথা লিখতে যেয়ে বন্ধুবর নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন ঃ বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি সংবাদ পত্র প্রধানতঃ সিনেমার সংগে জড়িয়ে অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যু সংবাদ ঘোষনা করেছেন এইটে দুঃখের বিষয় যেন সিনেমাই তার সব চাইতে বাড়া আর সব গৌণ। কিম্বা এও হতে পারে—চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে যাদের কারবার তারা অজয় বাবুকে কাছে থেকে জানবার অধিক সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তার ব্যাক্তিত্ব প্রভাবে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন তারই জন্য তারা অজয় বাবুর মৃত্যু সংবাদকে অন্যান্যদের চাইতে একটু অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন—শেষোক্ত কারণটি সত্য হ'লে বলবার কিছু নেই।" আমি বলবো শেষোক্ত কারণটিই সত্য। এবং এই শেষোক্ত কারণটিই আমাদের সব চেয়ে গর্বের—সবচেয়ে সান্ত্বনার যে চলচ্চিত্র জগতের অজয়ভট্টাচার্যের মৃত্যু সকলের মণিকোঠায় যেয়ে নাড়া দিয়েছে। আজ রূপ-মঞ্চ বিশেষ ভাবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছে—অজয় ভট্টাচার্যের প্রতি বিভিন্ন প্রয়োজক ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান—দর্শক ও শিল্পীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে রূপ-মঞ্চ আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে বলে।

অজয় ভট্টাচার্য নেই। তাঁর শোক সহ্য করবার ক্ষমতা তাঁর আত্মীয় স্বজনের ভিতর অভাব হবে না সে বিশ্বাস আমার আছে। নিষ্পাপ শিশু সন্তান দুটীরও পিতার মৃত্যু শোক উপলব্ধি করবার মত—আরও বেশীদিন লাগবে, বন্ধু বান্ধবদের ভিতর পরলোক বা ঈশ্বরে যারা বিশ্বাসী—আত্মার মঙ্গল কামনা করে—পুষ্পরথে মৃতের অদেহী আত্মার জয়যাত্রার পরিকল্পনা করেও সান্ত্বনা পাবেন। কিন্তু আমরা—আমাদের মত যারা মাটির মানুষের পূজারী—মানুষের প্রতিভার ভক্ত—তাদের কাছে অজয়ের সকাল মৃত্যুর সান্ত্বনা কোথায়?

তাই তাঁর স্মৃতিকে চির জাগরূক রাখবার জন্য—বাঙ্গালী দর্শক—শিল্পী ও কর্মীবৃন্দ—ত্রিপুরার বর্তমান ও ভাবী যুব শক্তি—যে যুব শক্তির প্রতীক বলে অজয় ভট্টাচার্য বিবেচিত হতেন—তাঁদের হাতে আমি আমার সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে রূপ-মঞ্চ অজয়-স্মৃতি-সংখ্যা পরমশ্রদ্ধার সংগে উৎসর্গ করলাম।

মানুষ অজয় মানুষের মনে বেঁচে থাক চির অজয়—চির অমর হয়ে।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

Phone Cal. 1931 Telegrams PAINT: SHOP
ESTD. 1888
Abinash CH. DUTT.
For PAINTS
23-2. Dharamtola Street, Calcutta.

"ধুলীতে নিলি জনম
খেলে যা ধুলখেলা
ওরে ও খাঁচার পাখী কেন
তোর পাখা মেলা?"

রূপ-মঞ্চের অজয় স্মৃতি-সংখ্যার জন্য লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে বাংলার প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী কানন দেবী অজয় বাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে আমাদের এই চিঠি লিখেছেন—

আপনার চিঠিতে অজয় বাবুর সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরোধ করেছেন। অজয় বাবুকে আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। এবং আমি মনে করি তাঁর মৃত্যুতে বাংলা দেশের সিনেমা শিল্প একজন শিক্ষিত ভদ্র ও বিশেষ প্রতিভাবান কর্ম্মী হারাল। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই শ্রেণীর লোক সিনেমা শিল্পে বিরল। কিন্তু আমি লেখিকা নই সুতরাং প্রবন্ধ লিখবার মত দুঃসাহস নেই। বিশেষতঃ অজয় বাবুর তিরোধান সম্পর্কে। আশা করি আমার অক্ষমতার জন্য মার্জ্জনা করবেন।

ইতি—
কানন দেবী

*

অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত অশোক ও ছদ্মবেশীতে শ্রীমতী পদ্মাদেবী যথাক্রমে তিষ্যরক্ষিতা ও সুলেখা চরিত্রে অভিনয় করেন। অজয় বাবুর মৃত্যুতে অজয় স্মৃতি সংখ্যার জন্য লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে শোকপ্রকাশ করে পদ্মা দেবী এই চিঠি দিয়েছেন—

শ্রদ্ধেয় ৺অজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার কাছে যেমন আকস্মিক আজ তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখাও তার চাইতে বেশী আকস্মিক। কবি অজয়বাবু, সুসাহিত্যিক অজয়বাবু, সুরসিক অজয়বাবুকে আমি চিনি না। যে অজয়বাবুর সাথে পরিচয়ে আমি ধন্য—তিনি শুধু আমার প্রণম্য।

অজয়বাবুর অকালমৃত্যুতে আরও অনেকের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সাথে—আমিও একজন পরমাত্মীয় বিয়োগের ব্যথা পেয়েছি এবং একে আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি ভিন্ন আর কিছু ভাবতেও পারি না।

আমার ক্ষীণতম কণ্ঠেও আমি ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা জানাই—হে ভগবান মায়ামুক্ত আত্মাকে শান্তিদান কর।

ইতি—
শ্রীমতী পদ্মা দেবী

'অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শুধু বন্ধুজনের নয়, দেশেরই হৃদয় ব্যথিত হ'য়েছে'

অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বম্বে থেকে খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত মধু বসু নিউথিয়েটার্স লিঃ এর অন্যতম প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালের কাছে যে চিঠি লিখেছেন।

"অজয়ের পরিবারবর্গকে আমার সমবেদনা জানিয়ে তোমার কাছে ইতিপূর্বে সে তার করেছি—নিশ্চয়ই তা পেয়ে থাকবে। অজয় আমার কিরূপ নিকটতম বন্ধু ছিল সে খবর তুমি জানো—বহুদিন আমরা এক সংগে মঞ্চে এবং পর্দায় কাজ করেছি। আমাদের সে বন্ধুত্বের দিনগুলির কথা চিরদিন আমার মনে অম্লান থাকবে। অজয়ের মৃত্যুতে আমি আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও একনিষ্ঠ সহকর্মী হারিয়েছি। আশা করি তার পরিবর্গকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাতে ভুলবে না।

ইতি—**তোমার মধুদা**

মধুবাবু ১৩ই তারিখে যে টেলিগ্রামটী পাঠিয়েছেন।

"Deefly grieved to learn about Ajoy Bhattacherjee's passing away. I have very fond memories of our working together for many years both on Stage and Screen : He has a sincere collegue and friend, please convey my heartly condolences to his berieved family. Madhu Bose.

শনিবার ১লা মাঘ বেলা ১১ ঘটিকায় উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে ছদ্মবেশীর উদ্বোধন উপলক্ষে ডি, লিউক্স পিকচার্স শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অজয় স্মৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ডি, লিউক্স পিকচার্সের প্রতিনিধি স্বরূপ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন :

সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ,

আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি : কালের কুটিল বিধানে আজকের এই আনন্দ-সম্মিলনী শোক সভায় পর্যবসিত হয়েছে। "ছদ্মবেশীর" চিত্ররূপ যাঁর স্নেহ ও পরিশ্রমের অবদান, কবিগীতিকার চিত্রপরিচালক অজয় ভট্টাচার্যই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর অভাব আমরা গভীর ভাবে উপলব্ধি করছি। তিনি জীবিত থাকলে আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে কোন ত্রুটী রাখতেন না, তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বে ও মিষ্টি ব্যাবহারে আমাদের সকল দৈন্য পরিপূর্ণ করে তুলতেন।

অজয় ভট্টাচার্য জনসাধারণের প্রিয় কবি। সঙ্গীতে ও সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্রপরিচালক হিসাবে তাঁর জয় যাত্রা সুরু হয়েছিল মাত্র। "ছদ্মবেশীর" আনন্দ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তাঁর সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও সৃষ্টিনৈপুন্যের পরিচয় আপনারা পাবেন, এ কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি।

উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অজয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বন্ধুত্বের যাদুস্পর্শ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের সান্তনা দেবার ভাষা আমার নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও শোকে মুহ্যমান। অজয়ের স্মৃতিজড়িত অতীতের অনেক আনন্দময় দিনের কথা আমার মত আজ বোধ হয় অনেকেরই স্মরণের পথে ভেসে আসছে। তাই আমাদের সান্ত্বনা। এবং অজয় আমাদের সকলের জন্যে যে হাসির উপঢৌকন সৃষ্টি করে গেছেন, তা সমবেত সুধীজনকে নিবেদন করে প্রিয় বন্ধুর অমলিন স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ছদ্মবেশী চিত্রের পরিচালক স্বর্গত অজয় ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ডি লিউকস্ পিকচার্সের পক্ষ থেকে জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন—।

[অশোক, ছদ্মবেশী (সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত) চিত্রের নবীন পরিচালক গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যুতে—পরিচালকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্য রূপমঞ্চ পত্রিকা ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির পক্ষ থেকে প্রযোজকদের কাছে যে আবেদন পেশ করা হয়—আমরা আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করছি যে মৃতের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় প্রযোজকরা দর্শক-সাধারণের আন্তরিক ধন্যবাদ পাবার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ছদ্মবেশী চিত্রের প্রথমে মৃত পরিচালকের ছবি রেখে শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস এই বাণী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পাঠ করেন। জনসাধারণের চাহিদা ও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে কর্তৃপক্ষ শুধু মৃতের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করেননি, বস্তুতঃ বাংলার দর্শক-সাধারণের মতকেও শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছেন।]

"ছদ্মবেশী চিত্রের আকর্ষণে আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, ছবি দেখার শেষে প্রসন্নমনে হাসি মুখে, তাঁরা বিদায় নেবেন এই আশাই আমরা রাখি। কিন্তু এই আনন্দ পরিবেশনের আগে গভীর বেদনার সংগে একটি শোচনীয় ব্যাপার আমরা স্মরণ না করে পারছি না। ছদ্মবেশীর দর্শকদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি যিনি রাখেননি, ছদ্মবেশীর স্রষ্টা ও পরিচালক সেই কবি অজয় ভট্টাচার্যই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। নির্বিকার মৃত্যু নিষ্ঠুর ভাবে অকালে তাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, নিজের সাধনাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিতরূপে দেখে যাবার গৌরব ও আনন্দটুকু তিনি ভোগ করে যেতে পারেননি।

অজয় ভট্টাচার্যকে বাংলাদেশ কিছুদিন মাত্র চিত্র পরিচালকরূপে জেনেছে কিন্তু তার বহু পূর্ব থেকে বাংলাদেশের হৃদয়ে কবি ও গীতিকার হিসাবে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। আধুনিক কালের বহু সুপরিচিত ও সর্বজনপ্রিয় গান তাঁরই রচিত।

তাঁর মত শক্তিমান স্রষ্টার কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা ছিল মৃত্যুর অতর্কিত যবনিকাপাতে, তা অনেকখানি অতৃপ্তই রয়ে গেল, তবু অকালে আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেলেও, তাঁর পরিচালনা-নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে, ছায়াছবির পর্দায় তার রচিত গানের মধ্য দিয়ে মানুষের কণ্ঠে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কাল যাকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারে না, মৃত্যুর পারে তাঁর সেই অম্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

দি মডার্ণ টকীজ লিমিটেডের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত ফনীন্দ্রচন্দ্র নান, অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখেছেন :

: আপনার ভ্রাতা গীতিকার ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। আমাদের ঐতিহাসিক চিত্র অশোক তার পরিচালক জীবনের সর্ব প্রথম চিত্র। এবং চিত্রের পরিচালনা সুষ্ঠু ভাবেই তিনি করেছিলেন। তার মৃত্যুতে শুধু আমাদের পরিচালক মণ্ডলীই নয়, সমস্ত চিত্র জগত শোকগ্রস্ত। যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন তারাই তার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হ'য়েছেন।

মৃতের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের জন্য আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাবেন ইতি—

দি মডার্ণ টকীজের পক্ষ থেকে
পি, সি, নান
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

'রবীন্দ্রভবন' শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন অজয় বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে যে চিঠি লিখেছেন—

খবরের কাগজে অজয়ের মৃত্যুসংবাদ দেখে বড়ই দুঃখিত হয়েছি। তোমাদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তাতে তোমাদের প্রতি অজ্ঞাতে যে হৃদয়ের আকর্ষণ জন্মেছে সেটা এখন বুঝতে পারি। নিজের ভাইয়ের মতো করে তোমাদের দেখেছি। বিজয়ের সঙ্গে আমি পড়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সব সহপাঠীর সঙ্গে তা হয় না। অজয় পড়ত সুধীরের সঙ্গে। তাদের মধ্যেও ঐ রকম সৌহার্দ্য ছিল। তোমার সঙ্গে সে সব উপলক্ষেই স্নেহ-সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি দুই জনকেই এক রকম করে দেখেছি। তাই আজ অজয়ের অতি অকাল তিরোধানে সে সব কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু তার মৃত্যুর এই বেদনা শুধু ব্যক্তিগত নয়। বাংলা দেশই তার কাছ থেকে অনেক আশা করছিল। তাই তার মৃত্যুতে শুধু বন্ধুজনের নয়, দেশেরই হৃদয় ব্যথিত হয়েছে। এই রকম মৃত্যুর কোনো সান্ত্বনা নেই, অথচ দুঃখ করেও কোন ফল নেই। কয়েক মাস আগে, বোধ হয় এপ্রিলে, যখন কলকাতা গিয়েছিলাম তখন অজয়ের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। কত আশা ছিল তার সম্মুখে। আর ক'মাস না যেতেই তার এই মৃত্যু বড়ই বেদনাদায়ক।

* * * *

প্রবোধচন্দ্র সেন

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটর্সের কর্তৃপক্ষ অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে যে পত্র লিখেছেন :

খ্যাতনামা কবি, গীতিকার ও বাংলার অন্যতম উদীয়মান চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে কলকাতা এম্পায়ার টকি ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিচালক ও কর্মচারিবর্গ আমরা একযোগে গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। চলচ্চিত্র শিল্পের যথার্থ অগ্রগতি ও কল্যাণকামী একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত আমরা জড়িত; সেই হিসেবে অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুকে আমরা অপূরণীয় ক্ষতি না মনে করে পারছি না এবং বিশেষ ক'রে ব্যথিত হচ্ছি এই ভেবে, যে তাঁকে এমন অকালে তাঁর কার্যক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে বিদায় গ্রহণ করতে হ'ল। আমরা এ অধিবয়ে নিঃসংশয় যে তিনি যদি ছায়াছবির ক্ষেত্রে আরও কয়েক বৎসর কাজ ক'রে যেতে পারতেন তা হ'লে অধিকতর খ্যাতি ও যশ তাঁর ভাগ্যে ঘটতো এবং বাংলা ছবিরও তাতে সত্যিকার সমৃদ্ধি সাধিত হ'তো। তাঁর মৃত্যু আরও বেদনাদায়ক এই জন্যে যে তিনি তাঁর শেষ চিত্র-সৃষ্টিকে চিত্রায়িত দেখে যেতে পারলেন না। আমাদের শুধু এই সান্ত্বনা যে কলকাতায় তিনটি চিত্রগৃহে সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত সেই ছবির অপরিসীম সাফল্য তাঁকে বহুদিন তাঁর দেশবাসীর স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখবে এবং চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব ও তাঁর মধ্যে যোগসূত্ররচনার কাজ করবে। তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক।

'কাল যাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে না, মৃত্যুর পারে তাঁর সেই অম্লান

কোয়ালিটী ফিল্মস এর শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন লাহিড়ী অজয় স্মৃতি-সংখ্যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে লিখেছেন ঃ

আজ অজয় স্মৃতি-সংখ্যায় অজয় সম্বন্ধে কিছু লেখবার জন্য সুযোগ পেয়ে লিখতে বসেই মনে হ'ল তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি।

বর্ত্তমান স্বনামধন্য পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর বাড়ীতে সকালবেলার একটি ছোটখাট জলসা হচ্ছে—গাইছেন ভীষ্মদেব। কালোয়াতি নয়, চেঁচামেচি নয়, ধীর সঙ্গতের সঙ্গে তার কণ্ঠ সুধাবর্ষণ করে চলছে—পাশে বসে ছিলেন এক ভদ্রলোক—তাঁকে চিনি না কিন্তু তাঁর সৌম্য প্রতিভা-দীপ্ত মুখ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিচয় হ'ল। সিনেমা জগতে তখন তাঁর গান লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সুরু করেছে কিন্তু সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে তখন তিনি সুপরিচিত।

প্রথম আলাপের সেই দিন তিনি যে ছাপ আমার মধ্যে রেখেছিলেন সেটুকু গভীরতর পরিচয়ে হারিয়ে যায়নি। পরিচালক হিসাবে তার কেবল হয়েছিল সুরু, হয়ত বাংলার ছায়াছবি তাঁর মত রসগ্রাহী সাহিত্যিকের পরিচালনায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করত। দুর্ভাগ্য আমাদের অভাবনীয়-রূপে তাঁকে আমরা হারালাম।

যাঁরাই অজয় বাবুর অন্তরঙ্গ একটি অভাব তাঁরা বোধ করবেন যে, একটি রসিক বৈঠকি বন্ধুকে আমরা হারিয়েছি, সে ক্ষতি আমাদের পূরণ হবে কি না তা জানি না।

বাংলাদেশে সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে বা পরিচালক হিসাবে তাঁর মৃত্যুতে যে কতটা ক্ষতি, তা সুধীজনই বিচার করবেন। কিন্তু আমরা আমাদের একটি সত্যিকারের সরল-প্রাণ রসিক বন্ধুকে হারিয়েছি সেই দুঃখটুকু দিয়েই তাঁর স্মৃতির তর্পণ করছি।

ভুবনমোহন লাহিড়ী
২৬।১।৪৪

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর তরফ থেকে অজয় বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত অজিত সেন লিখেছেন ঃ

বাংলাদেশের ছায়াচিত্রের দরবারে গল্প-লেখকের হয়ত অভাব নেই। কিন্তু যে কয়টী গীতরচয়িতার আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে কবি ও গীতকার অজয়কুমার ভট্টাচার্যের আসন ছিল সবার উপর। সমগ্রভাবে বিচার করলে, আধুনিক যুগের গীত-শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়া তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। চিত্র-নাটকের উপযোগী ঘটনা ও ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রুতিমধুর সঙ্গীত রচনায় অজয় বাবুর খ্যাতির কথা আজ আর কারো অজানা নাই। অকস্মাৎ অজয় বাবুর অকাল-মৃত্যুতে বাংলার ফিল্মশিল্প একজন উপযুক্ত কর্মীকে হারাল। বাংলার প্রত্যেক চিত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর অন্তরের যোগ ছিল এবং নির্বিচারে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের জন্যই তিনি গান রচনা করে দিতেন। সে দিক দিয়ে সমগ্রভাবে বাঙলার ফিল্মশিল্প তাঁর কাছে ঋণী। এই পরম উদার, মিষ্টভাষী ও নিরহঙ্কারী নীরব কর্মী, জীবন মধ্যাহ্নে ছায়াচিত্রের পরিচালকরূপে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগলাভ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, যে ছবিটী তাঁর প্রথম নৈপুণ্যের উল্লেখযোগ্য পরিচয়ে স্মরণীয় হলো—তিনি জীবিত থেকে তাঁর বিরাট সাফল্যের প্রাপ্য অভিনন্দনটুকুও গ্রহণ করে যেতে পারলেন না।

আজ তাঁর তিরোধানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের তরফ হতে তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। ইতি— **অজিত সেন**

প্রচার-সচিব, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, কলিকাতা।
২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৪।

স্মৃতির উদ্দেশ্যে, আমরা আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঈশ্বর পাঠশালার আদর্শবাদী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে যে চিঠি লিখেছেন।

"পত্রিকা মারফত অজয়ের মৃত্যু সংবাদ শেলের মতো আসিয়া বক্ষে বাজিয়াছে। এ বেদনা প্রকাশের ভাষা নাই।

২৬ বৎসর পূর্বের সমস্ত কথা আজ আমার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে—মায়ের মনে শিশুর প্রতিটি বুলি, প্রতিদিনের প্রতি হাসি খেলার মতো ধাত্রীর মতোইতো তাহার পা পা চলার পাছে চলিয়াছি—আজ একথাই মনে হয়। ব্যবসায়ীর জীবন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামি নাই। নামিয়াছিলাম একটা স্বপ্ন লইয়া এবং সে স্বপ্ন সফল করিয়াছ তোমরা। জীবনের সার্থকতার আনন্দ যাহাকে দিয়া পাইয়াছি সেই তো পরম আপনার জন। তাহাকে হারাইয়া মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া করিয়া জীবনের অন্য সকল লাভ লোকসান ভুলিয়াছিলাম।

স্বপ্নেও ভাবি নাই এত অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে হারাইতে হইবে।

* * * *

তাহার অমর আত্মা শান্তি লাভকরুক।

আশীঃ শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী—

শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সঞ্জয় বাবুকে অজয় বাবুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে যে চিঠি লিখেছেন।

বিমলার কাছে দুঃসংবাদ শুনে মর্ম্মাহত। বলবার কিছু নেই, কিন্তু এই দুর্লঙ্ঘ্য অবসরে তুমি ও তোমার আত্মীয় যেন নিমজ্জিত না হও এই আমার একান্ত প্রার্থনা এই কালো স্রোতের টান আমার অজানা নেই, আমি দুজনকে হারিয়েছি। কেবল অভিমান হয়, নয় কি?

ইতি—ধূর্জ্জটি

শিবপুর থেকে কবি গিরিজাকুমার বসু সঞ্জয় বাবুকে যে চিঠি লিখেছেন—

কালকের সংবাদ পত্রে অজয়ের লোকান্তরিত হবার খবর পাঠ করে মর্ম্মাহত হ'লুম।

* * * *

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রের দিক থেকে তার অভাব হয়ত পূরবে কিন্তু আমাদের অন্তরে সে যে অভাব ঘটিয়ে গেল তা পূরবে কেমন করে?

বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি অজয়ের পরলোক-গত আত্মার কল্যাণ করুন ও তোমাদেব সকলকে এই বিচ্ছেদ সইবার শক্তি দিন।

ইতি তোমার
গিরিজা দা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঈশ্বর পাঠশালার অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঈশ্বর পাঠশালার প্রাক্তন ছাত্র সুকবি ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা অজয়কুমার ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে ঈশ্বর পাঠশালা তাহার এক মহামূল্য রত্ন হারাইল এবং সমগ্র দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে কৃতী অজয়ের গৌরবমণ্ডিত স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

আজ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ঈশ্বর পাঠশালার শিক্ষকও ছাত্রগণের মিলিত এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং ভগবানের নিকট তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনা এবং তাঁহার স্বর্গত আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছে।

ব্রাহ্মণ বাড়িয়া,
৩।১।৪৪ ইং

শ্রীজানকী নাথ সরকার
সভাপতি।

"স্বপ্নের কবিরে,
ধরণীর পথে পথে এঁকে গেলি ছবিরে
স্বপ্নের ছবিরে—
(স্বপ্নের কবিরে)"

সর্ব ভারত খ্যাত বাংলার প্রযোজক প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ থেকে বাঙ্গালী গীতিকার ও পরিচালকের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র—ছোটাই বাবু নামে যিনি সকলের কাছে পরিচিত—যে শোক-বাণী পাঠিয়েছেন :

বাঙলাদেশে, মুখর ছায়াচিত্রের অগ্রগতির মূলে যে সব কর্মীরা শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন, অজয় ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁদেরই একজন। ছবির রাজ্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল গীত-রচয়িতা হিসেবে। মুখর ছবিতে সংযোজিত তাঁর লেখা বহু গান ভাবসম্পদে ও রচনা মাধুর্যে রসিকের চিত্তে রসের খোরাক জুগিয়েছে।

সর্বরকমে কৃতি ও কৃতবিদ্য অজয় ভট্টাচার্য নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতায় নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাঙলার মাটি ও জলের সংগে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। তাই তাঁর কাব্য ও সংগীত বাঙালীর চিত্তকে এত গভীর ভাবে অভিভূত করেছে। এই শক্তিমান গীতকারের অকাল মৃত্যুতে আমরা একজন সত্যিকারের কর্মীকে হারালাম। বাঙলার ছায়া-চিত্র-শিল্প তাঁর কাছে নানাভাবে ঋণী। আজ সে কথা আমরা গভীর বেদনা ও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি।

পরম মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও ভদ্র এই কর্মীর অনেক স্মৃতিই আমাদের মনে জমা হয়ে রইল। পরমেশ্বর তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তিবিধান করুন এইটুকুই আজ সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৪।

গীতিকার পরিচালক অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রাইমা ফিল্মস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ অজয় বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখেছেন :

আপনার ভ্রাতা গীতিকার ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তাঁর সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন তারা কেউই তার অমায়িক ব্যবহারের কথা ভুলতে পারবেন না।

চিত্র পরিচালক জীবনে তিনি সর্ব প্রথম আমাদের প্রযোজনা ও পরিবেশনাধীনে গৃহীত ঐতিহাসিক চিত্র অশোকের পরিচালনা করেন।

আমাদের পরিচালক মণ্ডলীর সকলেই এই শোকে মুহ্যমান। এক্ষতি সমস্ত চিত্র জগতের।

তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ থেকে
এম, ঘোষ—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র কর লিখেছেন।

প্রিয় সঞ্জয় দা,

কাগজে দেখলাম অজয়দার মৃত্যু হ'য়েছে। কি বলে' সমবেদনা জানাবো বুঝতে পারছি না। তাঁর মৃত্যুতে বেদনা বোধ করেছি—এইটুকুই জানালাম। সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হ'ল তার পূরণ হবে। নতুন ব্যক্তিপ্রতিভা এগিয়ে আসবে, আর আসছেও। তাই তাঁর অভাবে কাতর হইনি। বরং বেদনার মধ্যে এই আনন্দ পেয়েছি যে আমৃত্যু তিনি তার কর্তব্য করে গেছেন এবং সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অকিঞ্চিৎকর নয়।

প্রবোধচন্দ্র কর

"সাঙ্গ হ'বে ধূলি-খেলা
ভাঙ্গবে হেথায় মায়ার মেলা
ফেলে আসা পথের পানে
চাইবো না আর ফিরে।"

শ্রীহট্ট লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাশ লিখেছেন—চিঠিখানি অজয়বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব্বাশা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখিত।

"এই মাত্র মর্মান্তিক শোকাবহ সংবাদটি পেলাম। এমন আকস্মিক, এমন অপ্রত্যাশিত যে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। এই শোকে সান্ত্বনার ভাষা কোথায়—আমাদের ভাষা কত দুর্ব্বল, কত অক্ষম। সকল বেদনার বাণী সে বহন করতে পারে না। কি বলবো! এ ক্ষতি শুধু আপনার নয়, সমগ্র বাংলা দেশের। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের আর মাত্র দু'জন প্রতিভাবান শিল্পীকে আমরা অকালে হারিয়েছি—তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত ও কল্লোলের গোকুল নাগ। দেবার এঁদের অনেক কিছু ছিল কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর ফুৎকারে অপ্রত্যাশিত ভাবে জীবনের দীপ নিবে গেল।

আমাদের প্রিয় শিল্পী, কবি ও গীতিকার আজ বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু এ নিশ্চয় করে জানি—মৃত্যু তাঁর নেই—তাঁর স্মৃতির মধ্যে তিনি চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন, দেশ তাকে চিরদিন শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করবে—এর পর প্রার্থনা করি, ভগবান তার আত্মার মঙ্গল করুন আপনাদের এই শোকে তিনি সান্ত্বনা দিন।

ভবদীয়—**মৃণাল কান্তি দাশ।**

ভ্যারাইটী পিকচার্স ও ভ্যারাইটী ফিল্মস-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু কবি ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লিখেছেন :

গীতিকার ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্যের অকস্মাৎ মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। বাংলার চিত্র জগত অজয়বাবুর মৃত্যুতে একজন সত্যিকারের প্রতিভাবান—অমায়িক সুরসিক দরদীবন্ধুকে হারালো। এ ক্ষতি অপূরণীয় আগামী সংখ্যা রূপ-মঞ্চকে পরলোক গত পরিচালকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছেন জেনে—রূপ-মঞ্চের পাতায় আমি আমার প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ও ব্যক্তিগত ভাবে—মৃত্যের আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন করছি।

ভবদীয়—শ্রীনলিনীরঞ্জন বসু

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্সের প্রচার বিভাগ থেকে অজয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে এই চিঠি আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে এসেছে।

সাহিত্যের সংগে সিনেমার সম্বন্ধ ছিল এককালে ভাসুর-ভাদ্রবৌ। টকীর যুগে তার পরিবর্তন হোল। এই লজ্জা ঘুচিয়ে যাঁরা দুহাত এক করে দিলেন, শিক্ষিত বাঙালী একদিন তাঁদের দেখে বললেন—সাবাস্! কবি, সাহিত্যিক ও গীতকার অজয় ভট্টাচার্য ঠিক এই শুভমুহূর্তেই তাঁর কাব্য ও সংগীতের পসরা নিয়ে, সিনেমার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাগ্দেবীর বানী, আরোপিত হোল লক্ষ্মীর মুখে। সংলাপে ও সংগীতে মুখর হয়ে উঠলো শিল্প-পীঠ। বিদ্যার এই অতর্কিত আক্রমণে লজ্জা পেলো ভুঁইফোড়ের দল। পণ্ডিতরা সাবধান করে দিলেন তোমাদের নাচন-কাঁদনের পালা আজ শেষ হয়েচে বন্ধু—Thy kingdom is gone and gone for ever!

এই নতুন পরিবেশের মাঝে যাঁরা পেলেন আসন ও প্রতিষ্ঠা, তাঁদের পরিচিত করবার জন্যে কোন মুরুব্বীর দরকার হোল না। কোন সুপারিশ কাজে লাগ্‌লো না। কবি অজয় ভট্টাচার্য সেই নতুন দলের নতুন মানুষ। প্রতিভার গৌরব দীপ্তিতে তিনি উজ্জল করে তুল্‌লেন, তাঁর নিত্য নব সৃষ্টি। প্রাণরসের অফুরন্ত প্রাচুর্যে তিনি ঢেলে দিলেন তাঁর দান। সে দান দিল নির্জীব ছবিকে জীবনের গৌরব, অবজ্ঞাত সৃষ্টিকে আভিজাত্যের সম্মান। মানুষের শুক্‌নো মন সহসা একদিন রস-সরস হয়ে উঠলো সে অমৃতের স্পর্শ পেয়ে! সার্থক হোল তাঁর দান—রসিকের চিত্তে তিনি বেঁচে রইলেন অনন্তকাল ধরে।

আজ মৃত্যু যাঁকে সরিয়ে নিল নিতান্ত অকালে, তাঁর অভাবে যে বেদনা, যে শূন্যতা, তার কথাই আজকের দিনে বার বার মনে পড়চে। সকলের পেছনে থেকে যিনি একদিন সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই চির-সুন্দরের উপাসক, আনন্দ ও বেদনার কবি, অজয় ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ শুধু আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন কোরে বিদায় নিতে চাই। পরমেশ্বর তাঁর আত্মার শান্তিবিধান করুন, শুধু এই টুকু প্রার্থনা।

শ্রীসুশীলকুমার সিংহ।

এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

ঝাপসা ছবি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম কারোরই অবিদিত নেই। গল্প-সাহিত্যে নুতন ধারা প্রবর্তনের মূলে তাঁর প্রতিভা চিরদিনই সকলে স্বীকার করবেন। আধুনিক কবিতায় শ্রীযুক্ত মিত্রের দানের পরিমাণ অনেকের চেয়েই বেশী। এঁর বহু আখ্যায়িকা পর্দায় রূপায়িত হ'য়েছে। আমাদের সবচেয়ে আনন্দের বিষয় যে চিত্রজগত এরূপ প্রতিভাবান সাহিত্যিককে পরিচালকরূপে পেয়েছে। এঁর প্রথম ছবি সমাধান দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছে। বর্তমান ছবি বিদেশিনী কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে, অজয় বাবু এবং শ্রীযুক্ত মিত্র মূলতঃ একই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক]

মৃত্যুর অতর্কিত আঘাতে মন যখন মুহ্যমান তখন স্মৃতি ছবি স্পষ্ট করে তোলা একরকম অসম্ভব। আমাদের কাছ থেকে অজয় ভট্টাচার্যের শেষ বিদায় নিয়ে যাওয়া এমন আকস্মিক, এমন অকল্পিত-পূর্ব যে স্তম্ভিত বেদনার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে মন তার সমগ্র পরিচয় ঠিকমত এখন ধারণা করতে পারে না। কবি ও গীতিকার হিসাবে অজয় ভট্টাচার্যের কৃতিত্বের বিচার দূরে থাক—তার ব্যক্তিগত পরিচয়ও আশু বিয়োগ-বেদনায় এখন ঝাপসা হতে বাধ্য।

অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার আগেই তাঁর গান আমাদের কাণে এসে পৌঁছে ছিল। বাংলা দেশে আধুনিক গানের যে ধারা রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে তাঁরই প্রেরণা নিয়ে এখন প্রবহমান তার প্রধান উৎস বাংলার একটি ছোট জেলায় বল্লে কোন রকম অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক বাংলা গানে ভাষা, সুর ও রূপ যাঁরা দিয়েছেন ও দিচ্ছেন তাঁদের অনেকেই একই জেলার অধিবাসী এটি সে জেলার পক্ষে সত্যিই গর্বের কথা। বলা বাহুল্য কুমিল্লাই আমাদের বাংলা দেশের একটি প্রধান উৎস স্থান। অজয় ভট্টাচার্যের জন্মস্থান কুমিল্লা, এবং আধুনিক বাংলা দেশের ইতিহাসে তাঁর নামের উজ্জ্বলতা কোন দিন ম্লান হবার নয়।

সাধারণতঃ শিল্পী বা লেখকের মধ্য দিয়ে যে পরিচয় পাওয়া যায় ব্যক্তিগত চরিত্রের চেহারার সঙ্গে তার বড় একটা মিল থাকে না। কলম হাতে নিয়ে নিজের লেখার পিছনে যিনি দুর্দান্ত দুঃসাহসে সমাজের মূল ধরে নাড়া দেন সাধারণ জীবনে হয়ত মানুষের চোখে মুখ তুলে কথা বলার ক্ষমতাও তাঁর নেই। অজয় ভটাচার্যের বেলায় ব্যক্তিগত ও লেখনীগত চেহারার এমন একটি সুন্দর সামঞ্জস্য ছিল যা আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে। তাঁর গানের যে মধুর সংযত সরসতা বাংলা দেশের হৃদয় হরণ করেছে, তাঁর চরিত্রেও সেই বিশেষত্বটুকু ছিল। শুধু তফাৎ ছিল এই যে গানের সরসতা যেখানে কানে যেতেই ধরা পড়ে, সেখানে তাঁর চরিত্রের সরসতা আবিষ্কার করা ছিল সময়সাপেক্ষ। তিনি সেই জগতের মানুষ ছিলেন, একবার দেখেই যাদের সবটুকু চেনা যায় না। স্বল্পভাষী আত্মস্থ এই মানুষটিকে শুধু বাইরের মহল থেকে যাঁরা দেখে গেছেন তাঁরা তাঁর খুব সামান্য পরিচয়ই পেয়েছেন। স্বল্পভাষী হ'লেও তাঁর কথার ধার ছিল তীক্ষ্ণ, চরিত্রের দৃঢ়তাও ছিল সুস্পষ্ট। সাংসারিক উন্নতি বলতে আমরা যা বুঝি, সে বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন না। জীবনে নিজের উচ্চাশা সফল করতে ভীড় ঠেলে এগিয়ে যাবার সাহসেরও তাঁর অভাব ছিল না। কিন্তু বাইরের এই পরিচয়ের অন্তরালে কোথায় যেন আর একটি অতৃপ্ত মানুষ ছিল সঙ্গোপন, মাঝে মাঝে যার আকুতি তাঁর গানে, তাঁর কবিতায় ফুটে বেরিয়েছে। অন্তরঙ্গতার বিরল দু'একটি মুহূর্তে সে মানুষটির পরিচয় পেয়েছি বলেই আজ তাঁর স্মৃতি বেদনার বাষ্পে এমন ঝাপ্‌সা হয়ে আছে।

সস্ত্রীক অজয় ভট্টাচার্য

রূপ মঞ্চ : অজয় স্মৃতি সংখ্যা

অজয় পরিচিতি

কুমারশচীন দেববর্মা

[সুরশিল্পী শচীনদেবের সুর মাতাল করে তোলেনি এমন সঙ্গীত প্রিয় জন বাংলায় খুব কমই আছেন। বস্তুতঃ অজয় বাবুর সংগীত রচনার মূলে এঁর প্রেরণা অনেকাংশে সাহায্য করেছে। অজয় বাবু বেঁচে থাকা কালীন উভয়ই উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। একজন বলতেন—তুমিই আমায় গীত রচয়িতা করেছো—আমার ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছো তুমি। আর একজন উত্তর দিতেন—আমার সুরের তুমিই হচ্ছো প্রাণ। অনেকদিন আগেকার কথা—পাঠকমহলেও অনেকে থাকতে পারেন। বঙ্গবাসী কলেজের ক্যানিং হোষ্টেলে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শচীনদেবের সংগীতের প্রশংসায় যখন উপস্থিত ছাত্র ও সুধীবৃন্দ মুখরিত তখন শ্রীযুক্ত বর্মা—অজয় বাবুকে সামনে এনে বলেছিলেন—আপনারা যে প্রশংসা করছেন তা পাওয়া উচিত এঁর—ইনিই এ গানের স্রষ্টা। তখন নিজে ছাত্র। শচীন দেবের সেই কবি-পরিচিতি থেকেই নিজে অজয়ের ভক্ত হয়ে উঠি। অজয় বাবুর মৃত্যুতে শচীনদেব—একজন সত্যিকারের সখা ও সহকর্মী হারালেন। দু'জনের ভিতর ছিল যন্ত্র আর যন্ত্রীর সম্পর্ক।

অজয় বাবু পরিচালিত অশোক এবং ছদ্মবেশী দু'খানি চিত্রেরই সুর দিয়েছেন শ্রীযুক্ত বর্মা]

যৌবনের যাত্রাপথে অজয় ভট্টাচার্য

জগত পরিবর্তনশীল। যুগের পরিবর্তন ঘটে—পরিবর্তন ঘটে যুগধর্মের, জাতির সাহিত্য, দেশের সভ্যতার। এক শতাব্দীর সংস্কৃতির ধারা পালটে যায় অন্য শতাব্দীতে। শুধু কি তাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর ঘটে মানুষের সমাজে, মানুষের আনুসঙ্গিক প্রায় সকল কিছুরই। কেবল যা এ নিয়মের ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে মানুষের এক অতি বিশেষ চিন্তা। সেটা হচ্ছে এই!

যাঁরা মনস্বী, যাঁরা কবি যাঁরা শিল্পের পূজারী, যাঁরা কোন না কোন সৃজনী শক্তি নিয়ে এই পৃথিবীতে আসেন,

তাঁদের দেহাবসানকে প্রত্যক্ষ করে আমরা বলতে নারাজ হই যে, তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। দেহাবসানই মৃত্যু—সে সাধারণ মানুষের পক্ষে। কবি, শিল্পীর মৃত্যু দেহাবসানেই হয় না। সে মৃত্যু বরং আমাদের চোখে মস্ত বড় এক টুকরা অস্বীকার। যেহেতু, কীর্তি আছে যাঁর, মৃত্যু নাই তাঁর। একথা সত্য।

মিথ্যা হ'লে, প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্রযুগের শিল্পী কবিরা,—জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন প্রমুখ কবি, ঔপন্যাসিকরা আজও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কালজয়ী হয়ে বেঁচে থাকতেন না। বহুপূর্বেই বিস্মৃতির অতলগর্ভে তাঁদের সমাধি হয়ে যেত। আমরা তাঁদের ভুলে যেতাম। কিন্তু ভুলে যেতে পারছি না, তাঁরা আমাদের চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, যুগে যুগে সমাদৃত হয়ে আসছেন—কেন! সে শুধু অনন্যসাধারণ প্রতিভার বলে, অক্ষয় কীর্তির জন্যেই না তারা অমর হয়ে আছেন। তাঁদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাঁদের কীর্তির কথা আমরা ভাবতে পারি না, আর ভাবা যায়ও না, সেকথা ঠিক। তাঁদের কীর্তির বিষয় ভাবতে গেলে সবাগ্রে আমাদের মনে পড়ে যায় সেই কীর্তিমান স্রষ্টা মানুষটিকে। তা'ছাড়া তাঁদের কীর্তির প্রতি অনু পরমানুতে এমনই ব্যপকভাবে ছড়িয়ে আছেন যে, যেখানেই চাওয়া যাক না কেন, সেখানেই সেই সব স্রষ্টা মানুষগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তার পরও কি বলা চলে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। তখন শুধুই একথা বলা যায় 'কীর্তিযস্য স জীবতি'।

অতএব কবির কীর্তি তাঁর কাব্য, তাঁর কবিতা; শিল্পীর কীর্তি তাঁর শিল্পকলা। এই কাব্য, এই শিল্পের জন্যই কবি এবং শিল্পীর অমরত্ব,—অবিনশ্বরত্ব। অর্থাৎ কবিকে বাঁচিয়ে রাখে তাঁর কাব্য,—শিল্প রাখে তার স্রষ্টা শিল্পীকে অবিনশ্বর করে। তাই দেহাবসানের পরেও তাঁরা পরোক্ষ ভাবে হলেও, চির নবীন, চির ভাস্বর, চির প্রত্যক্ষ এক ঝলক বিস্ময় হোয়ে গণমনে, গণমনের মণি কোঠায় অমরত্বের আসন জুড়ে অধিষ্ঠান করেন।

তাই তারা মৃত্যুহীন:

আজ সে মৃত্যুহীনতার, সে অমরত্বের দাবী অজয়ও করতে পারে। কারণ, অজয় কবি, শিল্পের পূজারী, সৌন্দর্যের উপাসক। সে এসেছিল শক্তিশালী স্রষ্টার সৃজনী শক্তি নিয়ে। যার গভীর পরশ ছুঁইয়ে অন্যান্য সকলের মতই সেও তার রসানুভূতি, রসজ্ঞতা, সুষ্ঠু শিল্পজ্ঞান, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য পরিকল্পনার মণিমাণিক্যে গড়া যে-কাব্যলোক, যে-ছন্দময় গীতলোক সৃজন করে গেছে, তাকে প্রত্যক্ষ করে আজ একথা বলা চলে যে অজয় মরেনি, অজয় কোনদিন মরবেও না।

মোট কথা, অজয়ের সত্যকার পরিচয়, অজয় মরমী গীতিকার। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বাংলাদেশের নরনারীর ঘরোয়া জীবনের দুঃখ বেদনার কথা, গোপন মনের রহস্যকে কেন্দ্র করে অজয় অনেক কবিতা, অনেক গানই রচনা করে গেছে। তার প্রত্যেক কবিতা, প্রত্যেক গানটিই কল্পনার সৌন্দর্য সম্পদে, অনাড়ম্বর ভাবৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ। কি গান, কি কবিতার ভাষা, কোথাও একটু বলতে জড়তার ভাব বা দৈন্যের ভাব খুঁজে পাওয়া যায় না,—চিন্তাধারার মধ্যে সর্বত্রই স্বচ্ছন্দ গতি সংরক্ষিত হয়েছে, দেখা যায়। সংক্ষেপে, বলতে গেলে অজয়ের প্রায় সকল কবিতা, সকল গানের মধ্যেই তার শৈলী রচনা, স্বতঃ স্ফূর্ত কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়,—বেশ খানিকটা মৌলিকতার ছায়াপাতও দৃষ্ট হয় তার সকল রচনাতেই।

এই গান যতদিন আমরা বাংলা দেশের গীতশিল্পীরা গাইবো, যতদিন অজয়ের কবিতা, অজয়ের গান এ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে গুঞ্জরণ ধ্বনি তুলে স্বতঃ স্ফূর্ত লীলাছন্দে নেচে বেড়াবে, তাদের মনকে দোলা দেবে, তত-

দিন অজয়ের নাম পৃথিবীর বুক থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। যেতে পারে না।

তা'ছাড়া ততদিন আমরা তাকে তার কবিতা, গানের বিতান তলে বসে কখনও বা কাঁদতে শুনবো ব্যঞ্জনার সুরে দয়িতের গভীর বিরহ বেদনায় অভিভূত হয়ে; আবার কখনও বা তাকে প্রেমিকের ভাবাবেশে হাসতে শুনবো আশাদীপ্ত কণ্ঠে প্রিয়জনের সঙ্গে মধু-মিলনের পরম সুখানুভূতিতে। আমাদের মনের আদান প্রদান চলবে সততই। সততই সে আমাদের অন্তর মনে জাগরূক থাকবে সজীব সাড়া পাড়িয়ে। আমরা তাকে ভুলতেও পারবো না, ভুলতেও চাইবো না।

পক্ষান্তরে, সাহিত্যের দরবারে অজয়ের দান নেহাৎ হেলা ফেলার নয়। সে-দান সাহিত্য হাত পেতে তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছে। সেদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গিয়ে বলা চলে, অজয় অমর। সাহিত্যের চকবাজারে চলতে ফিরতে তার সঙ্গে আমাদের সদা সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ হবে।

সেই কারণেই সাধারণের দেহাবসানটাই যে তারও পক্ষে চরম পরিণাম - মৃত্যু, সেকথা আমরা কোনদিনই মেনে নিতে প্রস্তুত নই। সে বেঁচে থাকবে—কেননা, অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলে গেছেন,—

'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি' ॥'

সেকথার প্রতিধ্বনি করে আজ একথা অজয়ের সম্বন্ধেও বলা চলে; চলে না কি?

তারপর।

আমার বক্তব্য এই যে, কবি হিসাবে, গীতিকার হিসাবে, অজয়কে চেনেনা বা জানেনা এমন লোক বাংলাদেশে আশা করি খুব অল্পই আছে। সংখ্যায় তারা খুবই সামান্য যদি কেউ থেকে থাকেন। সেই কারণ, আমি তাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মানসে এই প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। এমন কি, তার কবি প্রতিভার সমালোচনা করাও আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

উদ্দেশ্য আমার অল্প কয়েকটি কথায় সেই আপন-ভোলা কবি মানুষটির আসল ঘরোয়া রূপটিকে সর্বসমক্ষে প্রকট করে তোলা। এবং এই জন্যই পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষ থেকে অনুরোধ এসেছে, এসেছে জোর তাগিদ।

অজয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প কাল হতেই। স্কুল লাইফে সে ছিল আমার সতীর্থ, নানা কাজে ও খেলায় সুখ দুঃখের সাথী। অতি ছেলেমানুষ বয়েস থেকেই সে কবিতা, গান রচনা করতে আরম্ভ করে। তার চর্চাও সে একনিষ্ঠ ভাবে করে আসছিল।

আমি জানতাম। তারপর:

কোলকাতায় এসে আমি সঙ্গীত চর্চায় ব্রতী হওয়ায় তার কথা আমার তখন বিশেষ করে মনে হয়। চিঠি লিখে ডেকে পাঠালুম অজয়কে। অজয় তখন থাকতো কুমিল্লায়, সেখানে থেকে সে করত শিক্ষকতার কাজ। আমার ডাক পেয়ে অজয় সে শিক্ষকতার কাজে ইস্তফা দিয়ে এলো কোলকাতায়। আমরা দু'জনে আবার অনেক দিন পরে একসঙ্গে মিললাম। সুরু হলো আমাদের পরস্পরের নির্দিষ্ট সাধনা। অজয় গান রচনা করে, আমি আরম্ভ করে দিলাম তার গান গাইতে।

দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অজয় সুনিপুণ গীতিকার বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করল বাংলা দেশে। তার প্রয়োজনও ছিল অজয়ের দিক দিয়ে। এমন কি কালে কালে সে সঙ্গীত রচনায় এমনই দক্ষ হয়ে উঠেছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে নির্দিষ্ট গানের ছকে ফেলে অপূর্ব গান রচনা করে দিতে পারতো কয়েক কাপ চা ও

কয়েকটা সিগারেট এবং কালি কলম কাগজ দিয়ে একটা জায়গায় বসিয়ে দিতে পারলে। দিয়েছেও সে কয়েক কাপ চা ও কয়েকটা সিগারেট খেতে খেতে আমার বাড়ীতে বসে আমার মনোনীত সুরের ছকে ফেলে আমার গান রচনা করে। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সহেলী গো,' 'তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছান পথে' ইত্যাদি। প্রথমটি রচনা করতে তার এক ঘণ্টারও কম সময় লেগেছিল। দ্বিতীয়টি সে রচনা করে দেয় মিনিট পনেরো সময়ের মধ্যে। সত্যি কথা বলতে কি, ক্ষিপ্র হস্তে গান রচনা করার ক্ষমতা আছে দেখেছি কাজী নজরুলের, আর ছিল অজয়ের।

অজয় মানুষ হিসাবে ছিল যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি ছিল ঋজু স্বভাবের মানুষ। আবার তেমনি ছিল কৌতুক প্রিয়, নিরতিশয় আমুদে লোক। চায়ের টেবিলে বসে, খোস গল্পের বৈঠকে বসে সে রসালাপের অবতারণা করে বেশ খানিকটা আমাদের জমিয়ে তুলতে পারতো, হাস্য কৌতুকের কথা বলে জানতো বেশ এক ঝলক হাসাতে। কথায় কথায় হিউমার দিয়ে কথা বলার শিল্পজ্ঞানও ছিল তার মধ্যে খুবই প্রবল। কথায় কথায়, অজয়ের মত সময়োপযোগী করে, কথা প্রসঙ্গে উইট্ ও হিউমারের সুষ্ঠু অবতারণা করতে আমি খুব অল্প লোককেই দেখেছি। সর্বদার সঙ্গী হিসাবে সে আমাদের কতই না আনন্দ দিয়ে গেছে। মানুষের চিত্তকে জয় করবার ক্ষমতাও তার ছিল যথেষ্ট।

একে সুরসিক, তায় ছিল তার কবি-প্রাণ; তাই তাকে আমাদের বড় ভাল লাগতো, তাই সে ছিল তার রসিকতাকে ঘিরে নিয়ে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার পথে অন্যতম মস্ত বড় আকর্ষণ। এ বিষয়ে আশা করি তাঁর বন্ধু আত্মজনেরা আমার সঙ্গে এক মত হবেন।

তারপর আর একটি কথা এই যে, জীবদ্দশায় অজয়কে নানা অবস্থার ফেরে পড়তে হয়েছিল, নানা দুঃখ কষ্টের তীব্রতার আস্বাদনও তাকে যে করতে হয়নি, এমন নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাকে কোনদিন আমি ভেঙে পড়তে দেখিনি। যখনই সে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়েছে, তখনই দেখেছি তার হাসি হাসি মুখ; টুকরো টাকরা দুঃখ কষ্টকে সে গ্রাহ্যই করত না। বিপদে আপদেও বিচলিত হওয়া—ছিল অজয়ের নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ। সে দুঃখ কষ্টে আমাকে ভেঙে পড়তে দেখলে, বিপদ্‌পাতে বিচলিত হতে দেখলে বরং বলত—এ জন্মে এই যে আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি তার পটভূমিতে ঐশী ইঙ্গিত কি আছে জানো, আসছে জন্মে আমরা দুঃখ কষ্টের অতীত হবো বলে।—তার আশাই আমাকে, তার আশাই তোমাকে দুঃখ সইবার শক্তি দিচ্ছে, তাইত দুঃখকে আমরা সইতে পারছি। ভেঙে পড়লে কি চলে।' ইত্যাদি অনেক কথাই সে বলতো, এবং তার কথাগুলো অযৌক্তিক নয় ভেবে মনে মনে অনেকটা বল ভরসা পেতাম।

কিন্তু হায়, কে আজ আর সে কথা আমাদের শোনাবে, কার সঙ্গে আজ আমরা বিমোহিত হয়ে চায়ের টেবিলে রসালাপে মাত্‌বো!

হে বাল্যবন্ধু—খেলায়, পড়ায়,—সুখে দুঃখে তুমি আমার সখা—ফিরে এসো। তোমাকে সহসা অতি মানব বলে দূরে সরিয়ে পূজা করতে আমার কষ্ট হচ্ছে—তুমি দোষ নিও না। তোমার মহাযাত্রার পথে তোমাকে পেছু ডাকলাম,—যেহেতু, দুটি কথা তোমাকে না শুনিয়ে আমি বিদায় দিতে পারবো না বলে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে পেছু ডাকার বাণী তোমার কাছে অশুভ হবে না। হে রসিক, তুমি নির্ভয়—তুমি চলেছ রসিক প্রবরের হাত ধরে রসলোকে। আমার শেষ অনুরোধ শুনে যাও সখা—আমাকে ভুলে তুমি থেকো না। ছেলেবেলার পেয়ারা চুরির পরামর্শের মত আজ তোমায় একটা পরামর্শ দিয়ে দিই—তোমার রসানুভূতির তীক্ষ্ণতায় সঞ্জীবিত রাজনিতিকের

ভাষায় রসিকপ্রবর গোলকপতিকে বুঝিয়ে দিয়ো—গোলকটিকে উপেক্ষা করে গোলকপতি হওয়া যায় না—আমাদের এই দুর্দশাক্লিষ্ট গোলকটিকে যেন একটু করুণার চক্ষে দেখেন,—তুমি বলো তাঁকে যে তোমাকে আমাদের কাছে ফিরে আসতে হবে—নইলে গোলকপতির দুর্নাম হবে।

গোলকের মানুষ আজ এত পিপাসিত যে বোধ হয় মহা প্রলয়ের অনন্ত জলধিও সে পিপাসা মেটাতে পারবে না—তাই করুণাময় যেন করুণা করে তাঁর দীন সন্তানদের জন্ত তোমার মারফতে মধুমন্ত্র পাঠিয়ে দেন—যে মন্ত্র জপ করতে করতে আমরা সর্বপিপাসাহারী অমৃতের সন্ধান পাই। তুমি মাটির পৃথিবীর মানুষ' তুমি জানো দেবত্বের চেয়েও মনুষ্যত্বের মর্যাদাই তোমার কাছে শ্রেয়। তোমার মানুষ সখার ভিক্ষা উপেক্ষা করবার অধিকার তোমার নেই।

সখা ফিরে এসো—নব রূপে, নব কলেবরে ফিরে এসো,—প্রেমের গানে প্রেমিক রতনকে কাঁদিয়ে তাঁর করুণার ঝুলিটাকে আমাদের জন্তে ছিনিয়ে নিয়ে এসো।

উত্তর পাড়ায় রবীন্দ্র স্মৃতি উৎসবে (১৯৪৩) সমবেত সুধীবৃন্দ।
পিছনের সারিতে অজয় ভট্টাচার্য (ডান দিক থেকে চতুর্থ)
মেয়েদের উপবিষ্ট সারিতে বাম দিকে প্রথমে স্ত্রী রেনুকা দেবী। শ্রীযুক্ত সজনিকান্ত দাস, প্রফুল্ল সরকার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেককেই দেখা যাচ্ছে।

ফিল্ম্ ধার দেওয়ার ব্যবস্থা

(৩৫ মিলিমিটার এবং ১৬ মিলিমিটার)

বার্ম্মা-শেলের 'একটি কেরোসিন টিন' নামক সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় শিক্ষামূলক চিত্রের একটি দৃশ্য

সর্ব্বসাধারণের রুচী অনুযায়ী নানা প্রকার মনোজ্ঞ বিষয় অবলম্বন করে' বার্ম্মা-শেল এবং অন্যান্য ফিল্ম্ প্রস্তুত কেন্দ্রগুলিতে নির্ম্মিত বহুসংখ্যক প্রচার চিত্র এখন সকলের পক্ষেই দেখার সুবিধা হয়েছে। যে কেহই শিক্ষামূলক অথবা দরোয়া প্রদর্শনীর জন্য আবেদন করলেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এগুলিকে পেতে পারবেন। এদের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যে কোনটিতে লিখ্‌লেই হবে।—পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, বার্ম্মা-শেল; বোম্বাই, কলিকাতা, নিউদিল্লী, করাচী এবং মাদ্রাজ।

KBFK 2

অজয়

খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়—চিত্রজগতে সাধারণতঃ হারুদা নামে পরিচিত। তাঁর অমায়িক ব্যবহার এবং বন্ধু প্রীতির আকর্ষণে অনেকেই দূরে থাকতে পারেন না, অজয় বাবুও তার এই আকর্ষণ থেকে দূরে থাকতে পারেননি। শুধু প্রযোজক রূপে নয় অজয় বাবু জেষ্ঠ্যের মত এঁকে শ্রদ্ধা করতেন। এবং হারুদার কতখানি স্নেহের অধিকারী হয়েছিলেন—হারুদার অন্তরের সে সন্ধান দূর থেকে আপনারা না রাখলেও আশা করি এই লেখাটীতে তার আভাস পাবেন। অজয় বাবুর মৃত্যুতে হারুদা একজন প্রতিভাবান সহকর্মী ও কর্তব্যপরায়ণ শ্রদ্ধাশীল ভাইকে হারিয়েছেন। তাঁর এ ক্ষতিপূরণ করবার হাত কারোরই নেই।]

অজয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব দীর্ঘদিনের না হলেও গভীর ছিল। সিনেমাক্ষেত্রে শুধু সহকর্মীরূপেই তাকে দেখিনি, একাধারে বন্ধু ও ভাইয়ের আসন তাকে দিয়েছিলাম, তাই তার অকাল মৃত্যু আজ আমাকে যে কোন পরম আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা দিয়েছে।

আমি চিরকাল বিশ্বাস করেছি এবং এখনও করি, যে দেশীয় সিনেমার সত্যকারের কল্যাণ সম্ভবপর হয়, যদি দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ এই শিল্পে যোগদান করেন। তাই যখন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সর্বশেষে অজয় আমাদের এই সিনেমাতে যোগ দিলেন এবং এর অর্থকরী দিকটির প্রতিই নজর না দিয়ে, একে হৃদয় দিয়ে ভালবেসে এর কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেন, তখন সত্যই আমার আনন্দ ও আশার সীমা

অজয় ভট্টাচার্য

রইল না। এই সব প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় দেশীয় সিনেমার যে যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

অজয় পরিচালক হিসাবে নূতন হলেও, বাংলার সিনেমার সঙ্গে তার যোগ ছিল দীর্ঘদিনের। সিনেমার জন্য গান রচনা করে, সংলাপ লিখে, কাহিনী সৃষ্টি করে, যথোচিত খ্যাতি সে বহুপূর্বেই অর্জন করেছিল। সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে অজয়ের নাম ও খ্যাতি কাহারও অপেক্ষা কম নয় এবং কেবল মাত্র এই একটী দিক থেকে বিচার করলেও, অজয়ের মৃত্যু আমাদের পরম ক্ষতি, এমন ক্ষতি—যাহার পূরণ সহজে হবে বলে মনে হয় না।

"ছদ্মবেশী"র পরিচালক হিসাবে অজয়ের সঙ্গে-আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়ে ওঠে এবং এই সময়েই তার সমস্ত

দিকটা আমার কাছে ধরা পড়ে। পূর্বে যাকে কেবল সাহিত্যিক ও সঙ্গীত রচয়িতা বলে জানতাম এই সময়ে তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে বিচিত্র গুণের সমাবেশ দেখে মুগ্ধ হই। এই সময়েই তার সঙ্গে আমার অন্তরের সত্যকারের যোগ হয়, এ বন্ধন অচ্ছেদ্য, কিন্তু বাস্তব আকার যে এত স্বল্পস্থায়ী হবে, তা আমার কল্পনারও অগোচর ছিল। অজয় নেই, তার সঙ্গে আর কখন দেখা হবে না, আর কোন দিন সে আমার ঘরে এসে তার নির্দিষ্ট স্থানটীতে বসে "হারুদা" বলে আমায় ডেকে আমার সঙ্গে কথা বলবে না, একথা ভাবতেও পারি না। অজয় যে চিরদিনের মত আমাদের ছেড়ে গেছে, একথা মন এখনও সহজভাবে গ্রহণ কর্তে চায় না।

কর্মক্ষেত্রে অজয়ের যে ধৈর্য, যে নিষ্ঠা দেখেছি, তার তুলনা হয় না। কাজকে সে সত্যিই ভালবাসত, তাই তার কাজে ফাঁকি ছিল না। অপরের মতকে সে উপেক্ষা করেনি কোনদিন। পরিচালক হলেও অজয় তার সহকারী ও সহকর্মীদের মতামত ও পরামর্শকে যথোচিত মূল্য দিয়ে বিবেচনা করে দেখ্‌ত। নিজের ভুলকেও সে স্বীকার করতে কখনও কোন সঙ্কোচ বোধ করেনি।

অজয় ছিল ব্রাহ্মণসন্তান। ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণই তার ছিল। শিক্ষায়, বিদ্যায়, জ্ঞানে, চরিত্রে, অজয় ছিল সত্যিই অজয়। তার সম্বন্ধে বলবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু এ তার স্থান নয় এবং সব কথা প্রকাশ করবার ক্ষমতাও আমার নেই।

অজয়ের মৃত্যুতে কেবল মাত্র বাংলা সাহিত্য এবং সিনেমারই ক্ষতি হোল না, বাংলাদেশ আজ সত্যিকার একটী মানুষকে হারাল। অজয়ের শোক আমাদের জনকয়েকের নয়, এ শোক সারা বাংলাদেশের। সে যতদিন বেঁচেছে, বাঁচার মত বেঁচেছে, তার যা দেবার ছিল, দিতে দিতে গেছে, থামেনি সে কোনদিন। এখানেই তার জীবনের সার্থকতা এবং এই দারুণ শোকে এই আমাদের পরম সান্ত্বনা।

অজয়ের বিধবা পত্নী, তার আদরের পুত্র-কন্যা, এবং অন্যান্য নিকট জনদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই। ভগবান তাদের এই নিদারুণ দুঃখ সইবার ক্ষমতা দিন—এই আমার প্রার্থনা।

Phone :
B. B. 5865
5866

On Government, Military, Railway & Municipality Lists

Gram :
Develop

A. T. GOOYEE & CO.
METAL MERCHANTS.
IMPORTERS & STOCKISTS OF
Copper & Brass Rods, Pipes, Strips, Sheets, Flats etc. and other nonferrous Metal articles.
49, CLIVE STREET, CALCUTTA.

"অজয়ের মৃত্যুতে কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্য এবং সিনেমার ক্ষতি হোলনা, বাংলা দেশ আজ সত্যিকারের একটী মানুষকে হারালো। অজয়ের শোক আমাদের জন কয়েকের নয়, এ শোক সারা বাংলা দেশের। সে যতদিন বেঁচেছে বাঁচার মত বেঁচেছে। তার যা দেবার ছিল, দিতে দিতে গেছে, থামেনি সে কোন দিন। এখানেই তার জীবনের সার্থকতা এবং এই দারুণ শোকে এই আমাদের পরম সান্ত্বনা।"

• ছবিখানি দেখিবার সময়
• হাসিবেন না
• এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসুন
• কিন্তু প্রতিজ্ঞা যেন থাকে

ছদ্মবেশী

ঃ একই সঙ্গে দেখান হইতেছে ঃ

শহরের চারটি বিখ্যাত সিনেমাতে

উত্তরা · পুরবী · পূর্ণ · আলেয়া

প্রত্যহ তিনবার ঃঃ ৩ টা, ৬ টা ও রাত্রি ৯ টা

অজয়ের স্মরণে

—সুধীরেন্দ্র সান্যাল—

[অজয়বাবু যখন নিয়েথিয়েটার্সের ছবির জন্য গান লিখতে আরম্ভ করেন তার পূর্বে থেকেই শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালের সংগে পরিচয়। এই পরিচয় ধীরে ধীরে হৃদ্যতায় পরিণত হয়ে ওঠে।]

জীবনে চলার-পথে এই যে জনতা ও কোলাহল, এরি ভেতর দিয়ে এক একজন লোক পথ করে সবার সামনে এসে দাঁড়ান। এঁদের পরিচয় বহন করে এঁদের প্রতিভা।

যে প্রতিভাধর শিল্পীর স্মৃতি পূজা করবার জন্যে এই আয়োজন, তিনি সংগে করে এনেছিলেন তাঁর কাব্য ও সংগীত। সে কাব্য ও সংগীতের সুর ছিল চেনা; কিন্তু ভাব ছিল নতুন। সেই অফুরন্ত রসপ্রবাহে বাঙালীর মন আজো বিভোর হয়ে আছে।

অজয় ছিলেন আমাদের বন্ধু। তাঁর মৃত্যুর তীব্রতা ও আকস্মিকতা আমাদের মর্মমূলে গভীর ভাবে আঘাত করেচে।

একদিন এই পরম রসিক ও দরদী বন্ধুকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম ঃ

ঃ আচ্ছা কবি, বল্‌তে পার, বাঙালী হাসে কেন? কীসের জোরে আমাদের এ হাসির দাবী?

তার উত্তরে কবি বলেছিলেন—

ঃ বাঙালী হাসে কেন? তার কারণ, তার বেদনাকে গোপন করবার আর কোন সহজ পথ খোলা নেই বোলে।

কীসের এ বেদনা?

এ বেদনা লজ্জার বেদনা; আত্মনিগ্রহের বেদনা; অভাব ও হাহাকারের বেদনা।

শতাব্দীর লৌহচক্রে নিত্য নিষ্পেষিত যে মানুষ—সেই মানুষেরই অন্তরের কান্না, কবি তার নিজ অন্তরের অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর 'মানুষ' কবিতায় ঃ

"দিনান্তের খেয়া ঘাটে রাত্রি লয়ে আঁখি জাগে
কহি আজো ফুরায় নি দিন,
শতাব্দীর লৌহচক্রে আজো মোরা নিষ্পেষিত
মানুষেরা হইনি বিলীন।
জ্বলে যাওয়া কুটিরের রুধিরাক্ত ভস্মস্তূপে
দেখিছ না মোরা খেলি ফাগ?
পূর্ণিমার চন্দ্র সাক্ষী, মৃত্যুমুখী আমরাও
প্রেয়সীর লভি অনুরাগ।

* * * *

স্বর্ণময় ধরিত্রীর অপর্যাপ্ত আদরের
নষ্ট শিশু তোমাদের দেখি,
হাসি মোরা ধূলিসাৎ বুভুক্ষিত শুদ্ধনর,
পরাজয় আমাদের সে কি?
ক্ষীণায়ু পুতুল হয়ে খেলা ঘরে কর বাস
সংঘাতের ভয়ে কম্পমান,
তৃষা-তীব্র আমরা যে তীক্ষ্ণ তলোয়ার জানি,
বিষরক্ত করিয়াছি পান;
শ্বেত সৌধে মণি-কক্ষে সভ্যতার ভীরু হিয়া
স্তিমিত লজ্জায় করে বাস,
আমরা যে কাপালিক, দীনতার পাত্র ভরি'
পান করি অনন্ত নির্যাস।
অলক্ষের জহুরী সে, সত্যের নিকষ পাতি
বুঝিয়াছে তোমরা যে মেকী,
স্বর্ণময় ধরিত্রীর অপর্যাপ্ত আদরের
নষ্ট শিশু তোমাদের দেখি।"

(ঈগল—অজয় ভট্টাচার্য)

যিনি আনন্দের আবরণে বেদনার অমৃতকে পরিবেশন করেছেন, সেই মানুষের কবি অজয় ভট্টাচার্যের স্মৃতি স্মরণে আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ নতশিরে নিবেদন করি।

মুখর ছবির পর্দায় অজয়ের শেষ স্মরণীয় দান

'ছদ্মবেশী'। মুখোস-পরা মানুষের হাস্যতরংগে হিল্লোলিত সহজ ও নিশ্চিন্ত জীবনে অফুরন্ত ভোগসুখের পিপাসা যেমন স্বাভাবিক, তেমনি স্বাভাবিক বস্তীবাসী হতভাগ্যের নিত্য অনাহারে অভ্যস্ত রিক্ততার বুক ফাটা হাহাকার! এই আনন্দ ও বেদনার পাশাপাশি ছবি, প্রাণরসে সরস হয়ে ফুটে উঠেচে পর্দার বুকে। জীবনের রংগমঞ্চে কতজন এমনি আসে ছদ্মবেশে, করে যায় কত প্রহসনের অভিনয়! 'ছদ্মবেশী'-র পরিচালক এমনি ছদ্মবেশেই একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন ছায়ার রাজ্যে—যার প্রায় ষোল আনাই মেকী নিয়ে কারবার! তাই অজয়ের শেষ প্রহসনে, নিজের জীবনের প্রহসনটাই আমার চোখে বেশী করে ধরা দিয়েছে। স্রষ্টার জীবনে সেখানেই সব চেয়ে বড় কমেডি যেখানে সে আর সকলকে প্রকাশ কোরেও নিজেকে সর্ব রকমে গোপন কোরে যায়। তাই এ মেকী ও ভেলের বাজারে যেটি সব চেয়ে আপশোষের কথা, সেটি হচ্চে এই যে, আদত মানুষটি চিরকালই মানুষের পরিচয়ের অন্তরালেই থেকে গেল, শুধু পড়ে রইল তার মুখোসে ঢাকা পরিচালকের রূপটুকুই!

যে রাজ্যে সাহিত্য হচ্চে পণ্য আর সে সাহিত্যের স্রষ্টা হচ্চে ফিরিঅলা, সে রাজ্যে বেচা-কেনার তুলাদণ্ডেই মানুষের প্রতিভার দাম নিরূপিত হয়। তাই এদের দরবারে কাব্যের বিচার, রসের বিচার, স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টির বিচার আমরা কামনাও করি না।

খেলা-ঘরের বালুচরে, দুদিনের খেলা-শেষে যারা পায়ের চিহ্ন রেখে যায়, মানুষের স্মৃতির সেই শেষ সম্বলটুকুই হয় ত' নিষ্ঠুর ভগবানের সার্থক আশীর্বাদ।

বন্ধনের বেদনা, ভালবাসার বেদনা, মানুষকে এমনি করেই সইতে হয়। অজয় সেই ভালবাসা দিয়েই ফতুর হয়েছিল, তাই বেদনাও তাকে বইতে হয়েচে। কেন সে ধরা দিয়েছিল তার জবাব সে প্রচ্ছন্ন রেখে গেছে তার কাব্যে। তবু তার রেশটুকু আজো অন্তরে দোলা দিয়ে যায়:—

"কে যেন কহিছে বিধাতার অপকীর্তি এ পৃথিবী
প্রতিরন্ধ্রে বিষ-বাষ্প; কেন তারে ভালবাসা দিবি?
আত্মার অজ্ঞাতে দুঃস্বপ্নের প্রেতভীরু কণ্ঠ মোর
আর্তনাদে কহিয়াছে—রে মানব, আসে মৃত্যু তোর,
মহাশূন্যে মহাকাল গ্রহতারা চন্দ্র সূর্য ল'য়ে
খেলার পুতুল করি' করে খেলা সৃজনে-প্রলয়ে।
কণ্ঠের সংগীত মোর আত্মারে কহিল—এ পৃথিবী
ক্ষণেকের ইন্দ্র ধনু, কেন তারে ভালবাসা দিবি?"

এ জিজ্ঞাসার কোন জবাব সে পায় নি। তবু সে বলেছিল:

"ভালবাসি মৃত্তিকার পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা।"

সেই ভালবাসার তীর্থসঙ্গমে মানুষের সাথে তার দুদিনের মিতালী, ক্ষণিকের ইন্দ্রধনুর মতই কত অকস্মাৎ ক্ষণিকে মিলিয়ে গেল! শুধু পড়ে রইল তার পায়ের চিহ্ন আমাদেরই চলার পথে। দুদিনের খেলার সাথীর শেষ খেলার শেষ বিদায়!

যে লোকটি আজ কেবল দুদিনের হাসি-কান্নার খোরাক জুগিয়ে চলে গেল, আত্মপ্রচারের দুর্নিবার মোহ যার চেতনাকে কখনও আশ্রয় করে নি, সেই পরম উদার, পরম মধুর মানুষের কবিকে আমি বার বার প্রীতি, ভালবাসা ও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। আত্মদম্ভে জর্জরিত সিনেমার বাইরেও যে বিরাট জগত—সে জগতে পড়ে রইল কবি-প্রতিভার বিচার ও বিশ্লেষণের ভার।

অজয় কবি

মন্দার মল্লিক

[মন্দার ফিল্মের তরুণ স্বত্বাধিকারী শিল্পী বন্ধু মন্দার মল্লিক অজয় বাবুর সংস্পর্শে এসে কতটা অভিভূত হ'য়েছিলেন। এর ভিতর তার পরিচয় পাওয়া যাবে]

পান্থশালায় হয় বহুলোক সমাগম। পথিকের প্রয়োজনেই পান্থশালা, পান্থশালার প্রয়োজনে পথিক নয়। যে পান্থশালা বুকে করে পথিকদের আশ্রয় দেয়, ক'জন পথিক তাকে ভালবাসে? ক'জন তার গায়ে নাম লিখে রাখে।

রাখে যারা লিখে রাখতে জানে। তা'ই ত' পান্থশালার দেওয়াল ভর্ত্তি—নামের ছড়া ছড়ি। কিন্তু সবই ত পড়া যায় না। কেউবা অস্পষ্ট, কেউবা অতি ক্ষুদ্র আকর্ষণহীন। আবার কেউবা উজ্জ্বল, স্পষ্ট, সুষ্ঠু ভঙ্গিমায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই পান্থশালাতেই আমাদের এক তরুণ কবির সঙ্গে পরিচয়। এই পান্থশালায় আশ্রয় কালে তিনি সমাগত জনগনের মনে দাগ রেখে গেছেন তাদের চিত্ত বিনোদন করে—গানে। তিনি ছিলেন প্রেমিক কবি। প্রাণের পরশ তিনি পেয়েছিলেন, তাই প্রেমের কবিতা শুনিয়ে তিনি সকলের প্রান স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। প্রেমের গান শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন আর তাঁর প্রেমিকের মত অমায়িক ব্যবহারে সকলকে আপন করেও নিতে পেরেছিলেন।

তাইত এত গভীর হয়ে বাজে। ছন্দ না ফুরাতে সুর না মিলাতেই সে কবি চলে গেল। জানা ছিল না ত তার যাবার সময়। সুরের মধ্যে যখন আমরা অভিভূত ছিলাম, তখন, কখন জানি না, ঐ অনন্ত পথের দরজা খুলে তিনি চলে গেছেন। রেখে গেছেন শুধু প্রতিধ্বনিত গান আর এই পান্থশালার দেওয়ালে সদ্য লেখা একটি উজ্জ্বল নাম—অজয় ভট্টাচার্য।

উপায় নাই! পান্থশালার ঐ খোলা দরজা অনন্তের দিকে। আমাদের প্রেমিক কবি অনন্তময়ের উদ্দেশ্যে অনন্ত যাত্রা করেছে। আমাদের চোখের অন্তরালে গেলেও আমাদের মনের অন্তরালে যেতে পারেনি। তাই আমরা সকলে সমবেত হয়ে সেই অনন্তময়ের কাছেই প্রার্থনা জানাই যেন আমাদের প্রেমিক কবির যাত্রা সফল হয়, যেন সে তাঁর শান্তিময় কোলে আশ্রয় পায়। আর ত আমাদের কিছু করবার নাই। আসুন আমরা তার গানের সুরেই সুর মিলিয়ে তার নামের উপরই মালা পরিয়ে দিই—অজয় কবি অমর হোক।

রীতিমত
রূপ-মঞ্চ
পড়ুন

স্মৃতিচারণ

নারায়ণ চৌধুরী

[শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী ছোটবেলা থেকে ছোট ভাইয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করে এসেছেন অজয় বাবুকে। অজয়বাবুকে তিনি নানাভাবে দেখেছেন—কুমিল্লার ও কলকাতার অজয় ভট্টাচার্য সমানভাবেই তার মনে রেখাপাত করে আছে। বর্তমানে সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান এম্পায়ার টকী ডিসট্রিবিউটর্সের প্রচার-সচীবরূপে তিনি কাজ করছেন—তাই চিত্রজগতের অজয় ভট্টাচার্যও তাঁর কাছে অপরিচিত নয়।]

কবি ভ্রাতৃদ্বয়—(বসে) অজয় ভট্টাচার্য
(দাঁড়িয়ে) সঞ্জয় ভট্টাচার্য

'অজয়দা'কে হারিয়ে বুঝতে পারছি তিনি আমাদের কতো আপনার জন ছিলেন। প্রথম যখন জানতে পাই তিনি মারা গেছেন তখন সমস্ত ঘটনাটা তলিয়ে দেখবার মতো আমাদের সময় ছিলো না; তাই একেবারে বেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়িনি। কিন্তু যতোই দিন যাচ্ছে আর সে সম্বন্ধে ভাবছি, একটা শূন্যতার পীড়নে মনের ভেতরটা কেমন যেন হাহাকার ক'রে উঠছে; পরমাত্মীয়কে হারিয়েও বুঝি মানুষ এতো বিচলিত হয় না। অজয়দা' আর আমরা একজায়গার অধিবাসী; সেই জন্যেই যে এ বেদনা তা নয়, কেননা মৃত্যুর বেদনাকে গভীর ক'রে তুলতে স্থানিক যোগাযোগটাই যথেষ্ট নয়, তারও বাড়া যোগাযোগ চাই। সেই যোগাযোগই অজয়দার সঙ্গে আমাদের ছিলো।

আজ অজয়দার কথা লিখতে গিয়ে বিগত দিনের কত কথাই মনে হচ্ছে। টুকরো টুকরো ঘটনার ছবি স্মৃতির পটে ভেসে উঠে মনকে আলোড়িত করছে। কৈশোর ও যৌবনারম্ভকালের কত মোহময় স্বপ্নরঙীণ দিনই না তাঁর সঙ্গে আমাদের একত্র কেটেছে; সে সব যতো মনে হচ্ছে মনের ভেতর একটা অস্পষ্ট ব্যথার ক্রন্দন অনুভব করছি। ভাবছি সে সব দিনের দু'চারটে ঘটনা—অতি তুচ্ছ অথচ অজয়দার চরিত্রপরিচিতির পক্ষে প্রয়োজনীয়—আপনাদের সামনে তুলে ধরলে বোধ হয় সেটা খুব অবান্তর হবে না। তাঁর কবিত্বপ্রতিভা, তাঁর বহুমুখী কর্ম-প্রচেষ্টার বিশদ আলোচনার জন্যে অনেকেই হয়ত আজ এখানে লেখনী ধারণ করেছেন; কিন্তু আমি সে দিক দিয়ে যাবো না। পত্রান্তরে এ সব বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি। আজকে শুধু নিতান্ত ছোটোখাটো সব ঘটনার

কথাই বলবো যাঁদের ভেতর দিয়ে অজয়দার আরও খানিকটা পরিচয় সকলের চোখে অবারিত হ'য়ে উঠতে পারেও বা।

খুব ছোটোবেলার কথা মনে হচ্ছে। তখন আমরা সামান্য বালক মাত্র; অজয়দা আমাদের চাইতে বেশ কয়েক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। বোধ হয় সে সময়টায় তিনি স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছেন। আমাদের স্কুলে পূজোর ছুটি উপলক্ষে নাটক হবে, সেই নাটকের মহলা চলছে। ক্লাসে পড়াশুনা হচ্ছে নামমাত্র; আমাদের সমস্ত মন প'ড়ে আছে সেইখানে যেখানে অজয়দা' তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে নাটকের মহলা দিচ্ছেন। ছুটির ঘণ্টা পড়তেই সব ভীড় ক'রে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতুম: যে যতোই যেতে বারণ করুক আমাদের ঠেকিয়ে রাখা শক্ত ছিলো—তখন মনে যে উৎসাহ ও সজীবতা ছিলো তার খানিকটাও যদি আজকের দিনে বেঁচে থাকতো তা হ'লে অসাধ্য সাধন করতে পারতুম। সে যাই হোক, অজদাকে দেখে আমাদের বালকমন আকৃষ্ট না হ'য়ে পারতো না। কেমন সুন্দর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, কি উজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত মুখ! শুনলুম নাটকটি অজয়দারই লেখা, নাম 'অগ্নিবীর' আর তিনিই তাতে প্রধান ভূমিকায় নাবছেন; এতো উৎসাহ যে কলেজের পড়া কামাই ক'রে দিনরাত স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মেতে আছেন, তবু তাঁর ক্লান্তি নেই। অজয়দার ছোটো ভাই সঞ্জয়দা'ও ছিলেন নাটকের পাণ্ডাদের একজন, তাঁর উৎসাহটাও কম নয়। আমরা ছোটোরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে তাঁদের কার্যকলাপ দেখতুম আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতুম আহা আমরাও যদি ওদের পাশে গিয়ে নাবতে পারতুম। অভিনয়ের রাত্রে অজয়দা কি অভিনয়টাই না করলেন! খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো বুদ্ধি তখনও হয়নি, তবু মনে আছে এমনি মুগ্ধ হ'য়েছিলুম সেই অভিনয় দেখে যে বহুদিন সে স্মৃতি ঘুমে জাগরণে থেকে থেকে আমাকে চকিত ক'রে তুলেছে। উৎসাহের আতিশয্যে আমরা ছোটো ছোটো ছেলেরা মিলে পাড়ায় রাতারাতি এক ষ্টেজ বেঁধে ফেললুম, ডেকে আনলুম অজদা'-সঞ্জয়দা'কে। কী, না, আমাদের পার্টগুলো একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে। বলা মাত্রই ওঁরা রাজী হ'য়ে গেলেন। দু'চারদিন রিহার্শ্যাল দেবার পর মহোৎসবে সে নাটকের অভিনয় আমরা করলুম। দ্বিতীয় রাত্রের অভিনয়ে কিন্তু এক মুস্কিল বাধলো। 'অগ্নিবীরে'র পার্ট যার করবার কথা 'প্লে' আরম্ভের সময় তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধানে জানলুম তার অভিভাবকেরা বাড়ীতে তাকে আটকে রেখেছেন, কিছুতেই আমাদের সঙ্গে মিশে তাঁদের সোনার চাঁদ ছেলেকে গোল্লায় যেতে দেবেন না এই হচ্ছে মতলব। অগত্যা কি আর করা, অজয়দা ঠেলেঠুলে সঞ্জয়দাকে পাঠালেন ষ্টেজে—পার্ট ওর ভালোই মুখস্থ ছিলো, আর অভিনয়েও উনি ছিলেন পারদর্শী, কাজেই শাপে উল্টো বর হ'লো। আমাদের 'প্লে' দেখতে না দেখতে উঠলো জমে।

আরও তিন বৎসর পরের কথা। কুমিল্লায় যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' প্লের অভিনয় হবে। বৈতালিকের গান গাওয়ানোর জন্যে কলকাতা থেকে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'কে আনা হয়েছে। অজয়দা, শচীন দেববর্মণ, জ্ঞান দত্ত, এরা আছেন পেছনে, নাটকটির সাফল্যের জন্যে এঁরা প্রাণপণ খাটছেন। খবরটিতে বৈচিত্র্যহীন মফঃস্বল শহরের জীবনে নতুন চাঞ্চল্যের ঢেউ জাগিয়ে তুলেছে। সবারই মুখে এক প্রশ্ন, কবে হচ্ছে 'সীতা' প্লে। আমার উৎসাহ আরও বেশি। নাটকে এই সব রথীমহারথীদের পাশে আমারও একটা ক্ষুদ্র স্থান ছিলো। স্থির হ'য়েছিলো বনবালার গানগুলো তিনটি ছেলেতে মিলে আমরা গাইবো। কিন্তু বনবালা আর কেউ হ'তে চায় না। অগত্যা বন-বালকরূপেই আমাদের বহাল করা হ'লো। কৃষ্ণচন্দ্র নিজে

আমাদের গান শেখাতে লাগলেন—তখনকার সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা কি আর ভুলতে পারি? অবশেষে 'প্লে'র দিন এগিয়ে এলো। যেদিন 'প্লে' হবার কথা, ঠিক তার পর-দিনই অজয়দার বি, এ পরীক্ষা আরম্ভ আর তাও ইংরিজি অনার্স পরীক্ষা। কিন্তু অজয়দা তাতে ঘাব্‌ড়াবার ছেলে নয়। দিব্যি রাত জেগে আমাদের সবার সঙ্গে তিনি অভিনয় করলেন. মুখের তাঁর এমনি একটা নিরুদ্বিগ্ন ভাব যে কে বলবে পরদিনই ভোরে তাঁকে এগজামিন দেবার জন্যে কলেজমুখো দৌড়তে হবে। পড়াশুনায় অজয়দা ছিলেন ক্লাসের সব চেয়ে সেরা ছেলে—কাজেই ভাবুন একবার, থিয়েটার করার কতোটা বাতিক থাকলে একটা লোক এগজামিনের পড়া কামাই ক'রে ওভাবে রাত জেগে হৈ হল্লা করতে পারে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। অজয়দা' ততোদিনে সম্মানের সহিত এম, এ পাশ ক'রে বেরিয়েছেন। কিছু কিছু গান তাঁর বাজারে ছড়াতে সুরু করেছে আর সেগুলো লোকের মুখে প্রশংসাও পাচ্ছে। আমাদের আড্ডা জমতো একটি ছোট চায়ের দোকানে—ততোদিনে অজয়দা'র সঙ্গে আমাদের বড় ছোটর ব্যবধান ঘুচে গেছে; বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও তিনি আমাদের সঙ্গে সমবয়সী বন্ধুর মতোই আচরণ করতেন সব সময়, আর তাঁর স্নেহের প্রশ্রয়ে আমরাও দিন দিন সাহসী হ'য়ে উঠেছিলুম। তবে যতোই কেন না ঘনিষ্ঠভাবে মিশি তাঁর মর্যাদাকে লঙ্ঘন করবার দুঃসাহস কারও কখনও হয়নি, প্রখর ব্যক্তিত্বের বর্মে সেই দিক থেকে তিনি দুর্ভেদ্য ছিলেন। চায়ের দোকানে অজয়দাকে ঘিরে আমরা সবাই গোল হয়ে বসতুম—তারপর সুরু হ'ত গল্প। এক এক দিন হাসি গল্পের স্রোত এমন অবারিতভাবে বইতে আরম্ভ করত যে নাওয়া খাওয়ার কথা কারও মনে থাকত না, আবার ওদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে অনেক রাত হয়ে গেলেও হুঁস্ ছিল না। মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাসে পড়েছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ড্রাইডেনকে ঘিরে নাকি কাফিখানায় এমনতর আড্ডা বসতো; ড্রাইডেনের নস্যির কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নিতে পারলে গুণমুগ্ধ তরুণ ভক্তদের নাকি মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম হ'তো। আমাদের অবশ্য সেরূপ কিছু হ'তো না, তবে এটা ঠিক যে অজয়দা' আমাদের বৈঠকের প্রাণ-কেন্দ্র ছিলেন—তিনি না হ'লে শত চেষ্টাতেও আমাদের আড্ডা ভাল ক'রে জমত না।

একদিন ঝোঁকের মাথায় আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করে ফেললুম একটি মাসিক কাগজ বার করতে হবে। যেমি ভাবা অমনি কাজ। কারও কাছে একটি কানাকড়িরও সম্বল নাই অথচ উৎসাহ আমাদের প্রচুর। অজয়দা'কে গিয়ে ধরলুম, বলতেই তিনি আমাদের প্রস্তাবে সায় দিয়ে ফেললেন। বেরোল 'পূবাশা' আমাদের তখন স্ফূর্তি দেখে কে! আজ সেই 'পূবাশা'ই বাংলা দেশের একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মাসিক কাগজে দাঁড়িয়েছে; অগ্রসর চিন্তাধারার দূত হিসেবে কাগজটি শিক্ষিত মহলে তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। অথচ মনে আছে প্রথম বৎসরে এর ওপর দিয়ে কত ঝড় ঝাপ্টাই না গেছে! সে সময় অজয়দা'র মূল্যবান পরামর্শ, সদাসক্রিয় সহযোগিতা এবং প্রয়োজন-কালে অর্থসাহায্য যদি না জুটতো তাহলে কাগজের অবস্থা কী দাঁড়াতো বলা যায় না। একটা ক্ষুদ্র চায়ের দোকান থেকে যে কাগজের উৎপত্তি সে কাগজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একদিকে যেমন সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অক্লান্ত পরিশ্রম নিত্যনবোন্মেষশালিনী উদ্ভাবনী শক্তি ও অজস্র ত্যাগবরণের ইতিহাস জড়িয়ে আছে তেমনি অন্যদিকে তার পেছনে অজয়দা'র পরোক্ষ অথচ মূল্যবান সহযোগিতাও কম কাজ করছে না।

পূর্বাশার প্রসঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনার কথা আমার আজও মনে আছে। প্রথম বৎসর 'পূবাশা'র পৌষ-সংখ্যায় 'দীপালী-সজ্জা' ব'লে আমি একটি কবিতা লিখি। আজকে

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কবিতাটিতে আন্তরিক রসানুভূতি পরিবেক্ষণ করার চাইতে একটা ভঙ্গিসর্বস্ব, অসুস্থ ভাবাপ্রাবল্যের পরিচয় দেওয়ার দিকেই ছিলো আমার বেশি ঝোঁক। কবিতাটি অনেকের কাছে প্রশংসালাভ করলেও অজয়দা'র চোখকে তা ফাঁকি দিতে পারেনি; কবিতাটির অত্যুগ্রতা তাঁর সহজাত রসবোধকে এমনভাবে পীড়া দিয়েছিলো যে তিনি এই নিয়ে আমাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন। সেই তিরস্কারের কথা আমি আজও ভুলিনি। আধুনিকতার মোহে সেদিন এমনি বিভ্রান্ত ছিলাম যে অজয়দা'র কথার যুক্তিযুক্ততা তখন পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি, হয়তো বা একটু ক্ষুব্ধই হ'য়েছিলুম। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সেকেলেপনা দেখে বোধ করি একটু করুণাবিমিশ্র ক্ষমাভাবও জেগেছিল আমার মনে। কিন্তু আজকে বুঝি সেই তিরস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি আমার কতো বড় উপকারই না করে গেছেন। অভিজ্ঞতার নজিরে আমার ভ্রান্তি তাঁর সত্যদিশার নিকট পরাজয় স্বীকার করেছে এতে লজ্জিত হবার কারণ দেখিনে। উল্টো এই আমার সান্ত্বনা যে তাঁর তিরস্কারবাণী আমার ক্ষেত্রে নিরর্থক তো হয়ই নি, বরং সেটা আমার জীবনে যথার্থ দিগ্‌দর্শনেরই কাজ করেছে।

আরও দু'তিন বৎসর পরের কথা। তখন আমরাও কলেজ থেকে বেরিয়েছি। হাতে কোনো কাজ ছিলো না; খাই দাই ঘুরি, অবসর সময়টা সঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়ে মেতে আছি। এমন সময় বিখ্যাত নাচিয়ে মনিবর্ধন সদলবলে কুমিল্লায় এসে হাজির। স্থির হ'লো একটি পার্টি নিয়ে তিনি আসাম ও পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলো পরিভ্রমণ করবেন। আরো অনেকের সঙ্গে আমি সেই পার্টিতে গায়ক হিসেবে যোগ দিলুম। কিন্তু দলের অধিনায়ক কে হবেন? মনোমত লোক কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে অজয়দা'কে গিয়ে ধরা হ'লো। প্রথমটায় আম্‌তা আম্‌তা করলেও সকলের পীড়াপীড়িতে শেষটায় তাঁকে রাজী হতে হ'লো।

আমরা সদলবলে একদিন কুমিল্লা থেকে যাত্রা করলুম। অজয়দা' ছাড়াও আমাদের সঙ্গে ছিলেন গ্রামোফোন-খ্যাত গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ: পরে চাঁদপুরের বিনয় মুখোপাধ্যায় ('যুগান্তর' কাগজের 'পথচারী') বর্তমানে ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের পদস্থ কর্মচারী) ও এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। অজয়দা'র ওপর ভার ছিলো মনিদা'র নৃত্যগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব ও তাৎপর্য নৃত্যারম্ভে দর্শকসাধারণকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া। কী সুন্দর ক'রেই না তিনি নৃত্যগুলোর ব্যাখ্যা করতেন! তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, মহিমান্বিত আবৃত্তির ভঙ্গি ও সরস বিশ্লেষণ যেন নৃত্যেরই একটা অংশরূপে নৃত্যগুলোর মর্যাদা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলো। যেখানেই গেছি, ঘন ঘন করতালির দ্বারা সর্বপ্রথম তাঁকেই আমরা অভিনন্দিত হ'তে দেখেছি। আর সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা, সাহিত্যরসিকদের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করা—কী অবলীলাক্রমেই না সে সব তাঁর আস্‌তো! শিলঙ-এ যখন গেলুম, নৃত্যসম্প্রদায়ের মধ্যে অজয়দা'কে পেয়ে সেখানকার লোকেরা যেন মেতে গেলো। গানের মধ্যে দিয়ে অজয়দা'র নাম আগেই সেখানে ছড়িয়ে প'ড়েছিলো; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে এতো লোক সমাগম হ'তে লাগলো যে আমরা পর্যন্ত অবাক হ'য়ে গেলুম। এমন কি সেখানকার পদস্থ ব্যক্তিরা পর্যন্ত অজয়দা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিরাট প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন ক'রে তাঁকে নানা জায়গায় আপ্যায়িত করলেন। অজয়দা' আমাদের ছাড়া কোথাও যান নি; কাজেই জনগণের হৃদয়ে তাঁর আসন যে কতো সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো সেটা খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ আমাদের ঘটেছিলো। আরেকবার নোয়াখালি সহরে একটি সমিতি উদ্বোধন উপলক্ষে অজয়দা' ও আমি নিমন্ত্রিত হ'য়ে সেখানে যাই। সেখানেও দেখেছি অজয়দা'র প্রতি জনসাধারণ কি গভীর শ্রদ্ধার ভাবই না পোষণ করে! অনুষ্ঠানে তিনি সকলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন—সেই আবৃত্তির ভঙ্গিতে অজয়দা' যেন আজও আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ভেসে বেড়াচ্ছেন!

অজয়দা'র সঙ্গে

অমল দত্ত

[শ্রীযুক্ত অমল দত্ত—অজয় বাবুর কুমিল্লার ভক্তদের দলের। কবিতা লিখে সাহিত্য ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমানে চিত্রজগত ও পূর্বাশা পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট। অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত 'অশোক' ও 'ছদ্মবেশী' দু'খানি চিত্রেই তিনি সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করেছেন।]

অজয়দার সম্বন্ধে কী বলবো? তিনি বীর, যুদ্ধমান সৈনিকের মত জয়যাত্রার পথে হঠাৎ পতিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু গৌরবের, যশের, সম্মানের। মৃত্যু প্রতীক্ষারত বৃদ্ধের স্তিমিত জীবন তাঁকে ভোগ করতে হয়নি, সংসারের অবহেলায় হয়নি তাঁকে বাস করতে। উজ্জ্বল তাঁর জীবন, কলহাস্যমুখর ছিল তাঁর পরিবেশ। নব নব সৃষ্টির উদ্দীপনা নিয়ে তিনি শুদ্ধ হয়ে গেছেন। প্রকৃতির কঠোর নিয়ম শুধু মাত্র মানুষের আকুল আগ্রহের মুখে কশাঘাত করেছে, কিন্তু অজয়দার জয়মাল্য একঘেয়ে জীবনযাত্রায় বাসি হয়ে যায় নি। তবুও অভিমান জাগে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কখনো কেউ ভাবতে পারে না। মৃত্যুর অমোঘ জয় আত্মপ্রকাশ দেখে মাঝে মাঝে জীবনাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়ে আসে—এ সংসারে কে কার? অজয়দা নেই, অজয়দার স্নিগ্ধ স্মৃতি নিয়ে আমরা প্রাত্যহিকের টানে ছুটে চলেছি। জানি না কে আবার কখন খসে পড়বে, বন্ধুবান্ধবের মিছিলে ফাঁক পড়ে যাচ্ছে যা আর কখনো পূরণ হবে না। অজয়দার সঙ্গে যে কটা দিন মিশতে পেরেছি, তা আমার স্মৃতির মণি-কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আজ তাই অজয়দাকে স্মরণ করতে গিয়ে, অতীতের কয়েকটি দিন আমার সামনে নতুন করে আবার ঝলসে উঠছে—ক্ষতির বাজারে তা-ই বোধ হয় আমার পরম লাভ।—

সৈনিক কবি নজরুল ইসলাম কুমিল্লাতে গিয়ে বীরের সম্মান পেয়েছিলেন। কুমিল্লার পার্বত্য আবহাওয়া, সাঙ্গীতিক পরিবেশ, শাল-সেগুন-মহুয়া ঘেরা বহু দীঘিকাকীর্ণ শহরের খেয়ালিরা ভাব বুঝি নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণার জন্যে বারুদ সঞ্চীবিত করে রেখেছিল। সমস্ত শহর প্রবল উন্মাদনায় তাঁকে গ্রহন করতে দ্বিধা করে নি। যে সমস্ত তরুণ নজরুল ইস্‌লামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলো, তার মধ্যে অজয় ভট্টাচার্য অন্যতম এবং প্রধানতম। এতদিন শুধুমাত্র সঙ্গীত চর্চাই প্রবলভাবে চলেছিল, এবার সাহিত্যের ফল্গুধারা বান ডেকে ছুটলো। অজয়দা'র প্রথম কবিতা "উল্কা" প্রকাশিত হয়েছিল নজরুল ইসলামেরই সম্পাদিত পত্রিকা "ধূমকেতু"তে।

কাজী নজরুল ইসলাম যে ক'বছর কুমিল্লায় ছিলেন, তখনও আমার বুঝবার বয়েস হয়নি। তিনি যে চমৎকার গান গাইতেন সে কথাই শুধু আবছা আবছা মনে আছে। কিন্তু আমার যখন বুঝবার বয়েস হয়েছে, তখন অজয় ভট্টাচার্য "হীরো"র আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

গান বাজনা ও খেলাধুলা—দুটোতেই কুমিল্লার লোকের প্রবল উৎসাহ। এবং এই দুই ব্যাপারেই অজয়দা অগ্রণী ছিলেন। কাজেই কুমিল্লার কিশোরদের কাছে তিনি যে বিস্ময়কর হবেন এ আর আশ্চর্য কি! সাহিত্য, গান ও খেলার প্রতি সমান উৎসাহ শুধু অজয় ভট্টাচার্যের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল।

১৯২০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত কুমিল্লার সুবর্ণদিন। কুমিল্লার খেলোয়াড়রা কলকাতায় প্রথম শ্রেণীর খেলায় এসে যোগ দিচ্ছে; কুমিল্লার গায়ক ও গায়িকারা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার সর্বত্র সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে; কুমিল্লার লেখক গোষ্ঠী সাহিত্যের ধারাকে নতুন খাদে প্রবাহিত করছে। কুমিল্লার ছেলে হয় বাঁশি বাজায়, নয় গান গায়, নয় কবিতা লেখে—এ কথা যেন অবধারিত সত্য। কলকাতার অনেক

জায়গায় আমি গান গাইতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। ওস্তাদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় একদিন বলেছিলেন, আপনাদের কুমিল্লার মাটিতে গান আছে, ও মাটি একবার খেয়ে দেখতে হয়। হয়ত তা লালমাটিরই গুণ, ভাগিরথীর তীর থেকে সংস্কৃতির কেন্দ্র সরে এসেছে ময়নামতীর কোলে।

সংস্কৃতি-চর্চার স্থান ছিল চায়ের দোকানে। কুমিল্লার প্রত্যেকটি চায়ের দোকানের পেছনেই একটি করে ফরাস-পাতা ঘর আছে এবং বিভিন্ন দলের বিভিন্ন নির্দিষ্ট চায়ের দোকান। এই চায়ের দোকানের পেছনেই বাংলার সাহিত্য, খেলা বা অভিনয় সম্বন্ধে প্রত্যেকদিন তুমুল তর্কের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে। এই চায়ের দোকানের আড্ডা একেবারে কুমিল্লার নিজস্ব, কারণ মফস্বলের কোন শহরেই চায়ের দোকানে মজলিস বসতো না। অজয়দা ঢাকা গিয়ে ফিরে চলে এলেন, কারণ সেখানে চায়ের দোকান একদম পাননা; কাজেই ঢাকাতে কী করে পড়াশোনা চলে? মরণের চারদিন আগেও তিনি দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সুধাবাবুর রেষ্টুরেণ্ট-এ আড্ডা জমিয়ে গেছেন। চায়ের দোকান তাঁর জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। কুমিল্লার যে সব গুণী আজ বাংলাদেশ বা ভারতের সর্বত্র সুনাম কিনেছেন, তাঁদের হাতেখড়ি হয়েছে চায়ের দোকানে।

পূর্ব্বাশা-গোষ্ঠী বলে আজ যারা পরিচিত, তাঁরা 'লক্ষ্মী-কেবিন' বলে একটা চায়ের দোকানে বসতেন। 'লক্ষ্মী-কেবিন দল' বলেই তাঁরা অভিহিত হতেন। চলচ্চিত্রে এদল থেকে দু'জন চিত্রপরিচালক বেরিয়েছে—সুশীল মজুমদার এবং অজয় ভট্টাচার্য; এবং তিনজন সঙ্গীত পরিচালক—কুমার শচীন দেব বর্ম্মন, জ্ঞান দত্ত এবং হিমাংশু দত্ত; তাছাড়া আরেক জন চিত্র-গীতিকার সুবোধ পুরকায়স্থ। তাছাড়া রয়েছেন গায়ক, বাদক এবং 'পূর্ব্বাশা'র শক্তিশালী লেখকদল এবংসম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রকাশক সত্য প্রসন্ন দত্ত। 'লক্ষ্মী কেবিনে' যারা বসতেন তাঁরা শুধু দলে ভারী ছিলেন না—তাদের ঘিরে অন্যান্য চায়ের আড্ডার গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজ করতো।

ইস্কুলের বয়েস থেকেই আমি এই দলের সঙ্গে মিশতে পেরেছিলাম। অবিশ্যি অভিভাবক স্থানীয় অনেকেরই এই ব্যাপারে যথেষ্ট অপত্তি ছিল কারণ চায়ের আড্ডা তো দূরের কথা চা নামক জিনিষটাই তখনও প্রৌঢ়দের মধ্যে উপযুক্ত ভাবে প্রচলিত হয় নি। কাজেই চায়চক্রের আড্ডাধারী বখেটেদের সঙ্গে আমি মিশি এটা অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই পছন্দ করেন নি। বাবা বল্লেন, যদি মিশতেই হয় তবে এদের মত বখাটেদের সঙ্গেই ভালো। আর যা-ই হোক শিক্ষিত বখাটে হবে।

অজয়ের প্রতি বাবার অন্ধ বিশ্বাস। কাজেই আমি খুব অল্প বয়েসেই চায়ের আড্ডায় প্রবেশ-পত্র পেলাম। এই চায়ের আড্ডা থেকেই কুমিল্লার সমস্ত সংস্কৃতি আন্দোলন পরিচালিত হোত। অজয়দা লিখছেন—জাতীয়সঙ্গীত, দেশনেতাদের অভিনন্দন পত্র, সাহিত্যিক অভিভাষণ। অজয়দা স্থির করছেন খেলার 'টাই', চায়ের কাপের উপরে খেলার মাঠের ঝামেলা রক্ষা করেছেন তিনি। শহরের যাবতীয় বিজ্ঞাপন ও সিনেমোর হ্যাণ্ডবিল এই আড্ডা থেকেই বেরিয়ে আসছে। বছরে তিনটে নাটকের মহলা চলেছে এই আড্ডায়। বলা বাহুল্য, অজয়দা সমস্ত নাটকেই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। তার একটা একটা বিশেষ পদবী ছিল—'ভংগীপণ্ডিত', যাত্রাগানে যাকে বলে motion master. পাবলিক থিয়েটারের শ্রীযুত শিশির ভাদুড়ী অভিনীত নাটকগুলো ছাড়া অন্য কোন নাটক আমরা মহলা দিতাম না বা ষ্টেজ করিনি—একমাত্র গোরা' ছাড়া। এ ভিন্ন আমাদের নাট্যসংঘের নাট্যকার হলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। মাত্র কিছুদিন হলো পাবলিক রংগালয়ে আড়াই ঘণ্টা অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু

চৌদ্দ বৎসর আগের থেকেই আমরা আড়াই ঘণ্টা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। সে জন্যেই বিশেষভাবে সঞ্জয় বাবুর নাটকগুলো লিখিত হয়েছিল। অভিনেতা হিসাবে অজয় ভট্টাচার্য ও সুশীল মজুমদার বাংলার দু'তিন জন অভিনেতার পরেই স্থান পেতে পারেন এবং আমাদের সম্মিলিত অভিনয় অনেক সময়ই বাংলার পাবলিক ষ্টেজকে হার মানিয়েছে। আমাদের অভিনয় দেখবার জন্যে ত্রিপুরার প্রতিবেশী জেলা-গুলো থেকেও দর্শক এসে ভীড় করতো।

অজয়দার অনেক বিখ্যাত গানই এই চায়ের আড্ডায় লিখিত হয়েছে। সুরদাতারাও সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। হাসি-ঠাট্টার মাঝে মাঝে গান ও ত্রিপুরাফুটের বিশ্রম্ভালাপ চলতো। আমাদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা হতো, কে কাকে wit দিয়ে জব্দ করতে পারে—কাজেই কেউ সহজে রেহাই পেত না। পানসা কথা কেউ বলতো না, কথায় humour থাকতোই। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ ও ভাষা আমরা ব্যবহার করতুম এবং প্রাদেশিক শব্দগুলি আসলে কোন্ প্রাকৃত বা সংস্কৃত শব্দ থেকে বিকৃত হয়ে এসেছে, সে আমাদের গবেষণার বিষয় ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে আমাদের জোর আলোচনা চলতো এবং বাংলা সাহিত্যের গতি কোন পথে, এ নিয়ে আমাদের চিন্তার বিরাম ছিল না।

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলন সুরু হলো। অজয়দা লিখলেন পতাকা অভিবাদন সঙ্গীত—

জয়তু পতাকা জয়
দূর কর তুমি মূক মন্ত্রে
মৃত্যুর ছায়া ভয়
তীর্থ জানিয়া তব পদতল
আসে ঐ ছুটে মহাবীর দল
ভারত গগনে রচিয়া সঘনে
সবারে দাও অভয়,
জয়তু পতাকা জয়।

অজয়দা লিখলেন প্রভাত দেবীর গান—

পূর্ব তোরণে রক্তলিখা
হানিছে অগ্নিবাণ,
গগনে গগনে ধ্বনিয়া উঠিল
ভারতের জয় গান।

যুবকদলকে আহ্বান করে প্রাণস্পর্শী ভাষায় অজয় ভট্টাচার্য লিখলেন প্রচারপত্র। লেখনীর মারফত তিনি এই আন্দোলনে যোগদান করলেন।

কিছুদিন পর ১৯৩১ সালের মাঝামাঝি শরৎচন্দ্র গেলেন কুমিল্লায়। অজয়দার নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাহিত্য বৈঠক হলো। অজয়দাই আমাদের সমস্ত প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের কাছে পেশ করলেন। কিন্তু জবাব যা আমরা পেলাম তাতে একটু ক্ষোভই হলো। শরৎচন্দ্র আধুনিক সাহিত্য প্রচেষ্টাকে প্রীতির চক্ষে দেখলেন না। ইতিমধ্যে 'কল্লোল,' 'কালিকলম' এবং 'প্রগতি' আর প্রকাশিত হচ্ছে না। 'ভারতবর্ষ' ও 'প্রবাসী'তে অতি আধুনিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াই চলছিল এবং 'বিচিত্রা'তে রবীন্দ্রনাথ ও আই, সি এস অভিজাতদের ছাড়া অন্য কারো লেখার কদর ছিল না। শুধু আধুনিকতা সঙ্গে যোগ কিছুটা রেখে চলছিল 'পরিচয়'। কিন্তু সেটা ছিল ত্রৈমাসিকী এবং আভিজাত্যের ছাপমারা পুরোদস্তুর।

এই সময় আধুনিক আন্দোলনে সহানুভূতিশীল একটা মাসিকীর অভাব বিশেষভাবে বোধ করা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই হলো 'পূর্ব্বাশা'র আবির্ভাব। 'পূর্ব্বাশা'র কভার ডিজাইন করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ও পরিচালক দিনেশ রঞ্জন দাস। অজদাকে আরো এগারোজনের সঙ্গে এক আনার ষ্ট্যাম্পের উপর দস্তখৎ করে অঙ্গীকার করতে হলো যে, পূর্ব্বাশাকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করতে হবে এবং এই জন্যে যদি ঋণ হয়, তার অংশ নিতে হবে। প্রথম বর্ষে

'পূর্ব্বাশা'র এরিশ ম্যারিয়া রিমার্ক-এর 'রোড ব্যাক' বাংলা অনুবাদ অজয়দা করেছিলেন, তাছাড়া তাঁর একটা একাঙ্কিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এবং অধ্যাপনা করে তিনি যা রোজগার করেছিলেন সবই 'পূর্ব্বাশা'র কল্যানে খরচ করেছিলেন। 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমরা বোধ হয় জীবনে কিছুটা সফলতা অর্জন করেছি। প্রথম সংখ্যা 'পূর্ব্বাশা' হাতে করে আমরা সবাই শিশুর মত বেই বেই করে নাচতাম।

দ্বিতীয় বর্ষ 'পূর্ব্বাশায় অজয়দার উপন্যাস 'যেথা নাই প্রেম' প্রকাশিত হলো। এরিমধ্যে অজয়দা গীতিকার হিসাবে কিছুটা যশ অর্জন করে ফেলেছিলেন। জ্ঞানদত্ত ও কুমার শচীন দেব বর্মনের নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামও সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি থেকে 'পূর্ব্বাশা' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতে লাগলো এবং অজয়দা ও আমরা অল্প কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মাত্র আসর জাগাতে 'লক্ষ্মীকেবিনে' রয়ে গেলাম। ১৯৩৩ সালের মাছামাঝি থেকেই আসরে ভাঙ্গন ধরেছিল। এরপর অজয়দা ঠিক এক বৎসর মাত্র কুমিল্লায় ছিলেন। এই সময়টা গান লেখায়ই তিনিজোর দিয়েছেন বেশী, সাহিত্য সাধনা শুধু 'পূর্ব্বাশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। তখন গানের আয় তাঁর বিশেষ কিছুই ছিল না বললেই চলে। ত্রিপুরার রাজকুমারদের শিক্ষকতা ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কয়েক মাসের অধ্যাপনার আয়ই তার সম্বল ছিল। কাজেই কলকাতায় গিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেবেন কী না, অজয়দা ভাবছিলেন।

১৯৩৪ এর অগাষ্ট মাসে একদিন অজয়দা আমাকে বললেন, 'অমল, কলকাতা চল্লাম। কর্তা (কুমার শচীন দেববর্মন) চিঠি লিখেছেন যেতে।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললুম : 'কিন্তু ভরসা কি?

"ভরসা কর্তা। তাছাড়া একটা এম, এ, ডিগ্রী আছে তো।"

অবিশ্যি এম, এ ডিগ্রী ও গোল্ডমেডেলিষ্ট ছাপটা কাজেই লেগেছিল। অজয়দা তীর্থপতি ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষকের পদ পেয়েছিলেন এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতার পদ তিনি ছাড়েন নি। কিন্তু তাঁর আয় ছিল গান ও সিনেমার গল্প ও সংলাপ রচনায়। কুমার শচীন দেব বর্ম্মন ও জ্ঞান দত্ত আদর্শ বন্ধুত্ব দেখিয়েছেন, তাঁরাই অজয়দার গান সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অজয়দার আর্থিক সাচ্ছন্দের কারণ হয়েছিলেন। তারপর অজয়দা অতি সহজেই আপন প্রতিভার প্রসাদে, নিউ থিয়েটার্স ও অন্যান্য স্থানে প্রবেশপত্র পেয়েছিলেন।

নিউ থিয়েটার্সে গান লেখা ভিন্ন অজয়দা কুমার প্রমথেশ বড়ুয়ার Script writer হিসাবেও কাজ করতেন। যে কোন ক্ষেত্রে অগ্রসারী মনোবৃত্তি দেখলেই অজয়দা আনন্দে অধীর হতেন, বড়ুয়া সাহেবের পরিচালনায়ও তিনি অগ্রসারী চিন্তা লক্ষ্য করেছিলেন। এজন্যে বড়ুয়া সাহেবের সহযোগী বলে তিনি গর্ব অনুভব করতেন। 'অশোক'-এ যখন আমি অজয়দার সহকারী হিসাবে কাজ করি, তখন তিনি বড়ুয়া সাহেবের পরিচালনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার কাছে লম্বা বক্তৃতা দিতেন এবং বলতেন, এমন ইনটেলিজেন্ট লোক এই লাইন-এ আর একটিও নেই, "with all his faults I adore him still."

Script লেখা বা পরিচালনায় অজয়দা বড়ুয়া সাহেবের প্রভাবমুক্ত হতে চান নি, যায় 'Beauty-spot' একখানা সুযোগ পেলেই তিনি লাগিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে 'জিন্দিগী' ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ছবি : জিন্দিগী ছবি নয়, একখানি কবিতা"—অজয়দার মুখে এ কথা অনেকদিন শুনেছি।

'অশোক' ছবিটার পেছনে একখণ্ড ইতিহাস আছে। 'মায়ের প্রাণ', 'নিমাই সন্ন্যাস' এবং 'মহাকবি কালিদাস' লিখে অজয়দা বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। মডার্ণ

টকিজ অজয়দাকে আহ্বান করলে একখানি পৌরাণিক কাহিনী লিখে দেবার জন্যে। তিনি বল্লেন, রক্তমাংসে গড়া প্রাণী ভিন্ন অন্য কারোর সম্বন্ধে আমি লিখতে রাজী নই। হয় সামাজিক নয় ঐতিহাসিক গল্প লিখতে বললে লিখতে পারি। তাঁরা বললেন, "সামাজিক ছবি তোলা আমাদের পক্ষে অসুবিধা, আপনি ঐতিহাসিক গল্প দিন।"

স্থির হলো—'অশোক। পরিচালনার দায়িত্বও অজয়দাকে নিতে হলো। বন্ধুবান্ধবরা আমাকেও অজয়দার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলেন, কারণ সাহিত্যের মত সিনেমাও creative art, অথচ এটা এখনও উপযুক্ত সম্মান পাচ্ছে না। প্রথম দিনই অজয়দা বললেন, "চলে আয় অমল, এই ইন্ডাষ্ট্রির ভবিষ্যত উজ্জ্বল যত শিক্ষিত লোক ঢোকে ততই মঙ্গল।"

বাবা লিখলেন—অজয় যখন আছে তখন আমি নিশ্চিন্ত আশা করি অজয় সিনেমার বদনাম ঘোচাতে পারবে।

হয়তো তিনি ঘোচাতে পারতেন। তাঁর মত একধারে সদালাপী, হাস্যরসিক, সরলপ্রাণ, উচ্চ শিক্ষিত লোক বিরল। যার সঙ্গে তাঁর এক দিনের পরিচয় তাকেই তিনি বন্ধুত্বের নিগড়ে বেঁধে নিয়েছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁর প্রশংসায় উচ্চমুখ, এমন কি সেটের সাধারণ কুলি পর্যন্ত অজয়বাবুর জন্যে খাওয়া দাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে হাসি মুখে কাজ করে গেছে।

রাধা ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে 'অশোকে'র সৃষ্টি। এর আগে এই ষ্টুডিয়ো দুই বৎসর বন্ধ ছিল। তাতে আমাদের কিছুটা অসুবিধার কারণ ঘটেছিল। তাছাড়া আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নবাগত। অজয়দা বলতেন, "আমরা নবাগত কিন্তু নভিস নই—এটাই আমরা প্রমাণ করবো।" এ কথা কি সত্যি নয়? 'অশোকের' মধ্যে নতুন পরিচালকের দৃষ্টিভংগীর নতুনত্ব কোথাও কি প্রকাশ পায় নি?

পরিচালনায় তিনি নিজেকে শিক্ষার্থীই ভাবতেন। বিশিষ্ট পরিচালকদের সম্বন্ধে তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষন করতেন। সুধাবাবুর চায়ের দোকানে একদিন নীতীন বসুর বিচারের আলোচনা চলেছে—অজয়দা গভীর মর্ম বেদনার সঙ্গে বললেন, "লোকে নীতীনবাবুর নিন্দে করছে আমার মনে হচ্ছে ধরণী দ্বিধা হও। ভারতবর্ষের বেষ্ট টেকনিশিয়ান, কী তাঁর লাইটিং, কী তার টেকিং হায় হায় গর্বে বুক ফুলে ওঠে। আর আজ কি না তাঁর নিন্দে শুনতে হচ্ছে।"

ঐ রেষ্টুরেণ্ট-এ একদিন হেমচন্দ্র এলেন চা খেতে। গল্পগুজব করে তিনি চলে যাবার পর অজয়দা আমাকে বললেন, "বুঝলি অমল, এমন ডিরেক্টর খুব কম আছে, তাঁর বলবার ভংগী এমন simple—গুয়াণ্ডারফুল।

আমি গম্ভীরভাবে জবাব দিলুম—"আর বাকী রইলেন দেবকী বোস।"

অজয়দা উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এঁদের কথা বাদ দে, বাংলার যে কোন ডিরেক্টর ইণ্ডিয়ার বেষ্ট। বাংলার ব্রেনের কি তুলনা আছে।"

"কিন্তু বড়ুয়া সাহেব?"

"বড়ুয়া সাহেব সেণ্ট পার্সেণ্ট বাংগালী—আবার কি।"

'ছদ্মবেশী' অজয়দা'র দ্বিতীয় এবং শেষ চিত্র। ডি, ল্যুক্স পিকচার্সের প্রয়োজনায় এই ছবি তোলা হয়েছিল এবং এই প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্ণধার সেই জনপ্রিয় 'হারুদা'—খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অজয়দা গভীর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলন। আমরা যেন নির্বাসিত অবস্থা থেকে একটা পরিচিত পরিবেশে প্রবেশ করলুম। এখানে বেশ আবদার খাটে। 'অজয়বাবু' শেষটায় এসে দাঁড়ালেন 'অজয়', তুই'-এ এবং হারুদার কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য ছিল দৈনন্দিন তিনটি পুরস্কার, মধুর সম্ভাষন—ইডিয়ট, ফুল, ননসেন্স।

রঙ্গ-মঞ্চ

অজয়দার মৃত্যুর পর হারুদা একদিন বললেন, "অমল, বেশতো ছিলুম ভাই, আমিও জানতুম অজয় ভশ্চাযি গান লেখে, দু-একবার এসেছেও এই অফিসে—কেন তাকে ডিরেক্টর পছন্দ করে বসলুম, কেনই বা পরিচয় হলো—এখন এমন যন্ত্রণা পাচ্ছি। সেও ছিল দূরে দূরে, আমিও ছিলুম দূরে দূরে, এই তো ভালো ছিল।"

এই বোধহয় ভালো, মানুষ যন্ত্রের মতো নিজের কাজ করে যাবে—কারোর সঙ্গে কারোর পরিচয় নেই। 'ছদ্মবেশী' চিত্র নির্মানের মধ্য দিয়ে যেমন সত্যিকার বন্ধুত্বের স্বাদ পেয়েছি, তেমন হারিয়েওছি কয়জন বন্ধুকে। এঁদের কথা বারবার মনে পড়ে। বেশ মনে পড়ে? আমার উপর ওঁদের কিসের জোর?

'ছদ্মবেশী'র ভূমিকালিপি ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু ছবি বিশ্বাসের কোন ভূমিকা স্থির করা গেল না। কানু ছাড়া গীতি নেই, ছবি ছাড়াও ছবি হয় না। অজয়দা জোর দিলেন, "ছবিকে রাখতেই হবে, নতুন character তৈরী করবো।"

আমরা স্থির করলুম খানিকটা socialism এই ছবিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যাতে লোকে হাসির মাঝেও দুই-একটা বুলি মাথায় বয়ে নিয়ে যায়। তা-ই 'মিষ্টার বোসের অবতারণা। যাঁরা 'ছদ্মবেশী' দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ছবিবাবু এই ভূমিকায় এমন অপূর্ব অভিনয় করেছেন যা মনে দাগ কেটে যায়। ছদ্মবেশী'র আসল ভূমিকাগুলো হতে প্রিয়বন্ধু ছবি বিশ্বাসকে সরিয়ে রাখবার পেছনে রয়েছে অজয়দার সাহিত্যের আধুনিক ধারার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং এই সম্বন্ধে কিছু করবার প্রয়াস।

পুরণো রোম্যান্টিসিজম্-এর কপচানো বুলিতে সাহিত্যের ক্ষতিই হচ্ছে, এ সম্বন্ধে অজয়দা অবহিত ছিলেন: সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো সমাজ-সেবা, তাই সমাজের কাঠা-মোটা যারা বহন করছে, সেই নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে চেতনা সঞ্চারই প্রতি লেখকের কর্তব্য। অজয়দার বিগত দুই বৎসরের রচিত কবিতাগুলোর মধ্যে সাম্যবাদের গন্ধ রয়েছে। তাঁর শেষ কবিতার বই 'সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা'য় যেন জনসাধারণ আপনাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছে। 'শারদীয়া সংখ্যা যুগান্তরে' প্রকাশিত 'ল্যাম্প-পোষ্ট' কবিতাটির তুলনা মেলা ভার, এতে যেন বুভুক্ষিতের চাপা কান্না গুমরে গুমরে উঠেছে।

অজয়দার সাম্প্রতিক গানগুলিও চাঁদ-তারা বর্জিত হয়ে অনেকটা objective রূপ ধরেছিল। তিনি একটা অভিনব টেকনিক খুঁজে পেয়েছিলেন, যা একান্তই অজয় ভট্টাচার্যের। তাঁর গানে কবিত্ব ছিল না, সহজ প্রাণের কথা—সোজা এসে বুকে বিঁধে, চিন্তার অবকাশ নেই। অজয়দার গানের আগে আধুনিক বাংলা গান বলতে তেমন কিছুই ছিল না এবং অজয়দার রচনা দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের গান 'বাংলা ক্ল্যাসিক্যাল' গানের মর্যাদা পাবে। জনসাধারণকে উজ্জীবিত করবার জন্যে তিনি 'নতুন আশার' গান লিখতে সুরু করেছিলেন মাত্র। আর লিখতে সুরু করেছিলেন রুশিয়ার জননায়ক লেনিনের একটা সহজ জীবনেতিহাস।

সাধ পূর্ণ হলো না। জনসাধারণের কবি আশা নিয়ে মরলেন।

> **SPORTS & SCREN**-এর অভিমত ছদ্মবেশী সম্পর্কে: "Fills to the brim with enjoyable laughter and clever ideas; the dramatic yarn adds much to the gaiety of life." (15. 1. 44)

অজয়

-সুশীল মজুমদার-

[পরিচালকরূপে শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের নাম চিত্রামোদীদের অজানা নেই। সম্প্রতি বম্বে টকীজের হয়ে দ্বিভাষী চিত্র তুলবেন বলে চুক্তি বদ্ধ হয়েছেন। আমাদের বম্বের প্রতিনিধির মারফতে অজয়-স্মৃতি সংখ্যার জন্য অজয়বাবু সম্পর্কে এই লেখাটী পাঠিয়েছেন। অজয়বাবুকে সর্বপ্রথম গীতিকার রূপে চিত্র জগতে তিনিই পরিচয় করিয়ে দেন—এজন্য চিত্র জগত তার কাছে একদিক দিয়ে যেমনি ঋণি—তেমনি সুশীলবাবুর লেখার ভিতর এই সত্যটুকু ফুটে উঠেছে সত্যিকারের প্রতিভাও অনেক সময় এই জগতে প্রবেশ করতে পথ খুঁজে পায় না এদের গোড়ামির জন্য। সুশীলবাবু এবং অজয়বাবু খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রিয় বন্ধুর বিয়োগ ব্যথা তার প্রাণে যে কতটা বেজেছে তা সহজেই অনুমেয়।]

অজয় আর ইহলোকে নেই, এ কথা প্রথম শুনলাম যেদিন সেদিনও যেমন বিশ্বাস কর্তে পারিনি আজও তেমনি সমান অবিশ্বাস্য বলেই ঠেকছে। কি করে হতে পারে? আমি যেদিন বোম্বাই রওনা হয়ে আসি তার আগের দিনই অজয়ের সঙ্গে দেখা রীতেনের আফিসে। সেই সদা হাস্যময় মুখ, শুভেচ্ছা জানালে আমায়, বললে "আমরা আশা করে রইলাম তোর কাছ থেকে অনেক কিছু। বাঙলায় যেমনি সফল হয়েছিস নতুন জগতে যেন উজ্জলতর হয়ে ওঠে তোর নাম", সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি যে এইটাই হবে আমাদের শেষ দেখা। সেদিন মৃত্যুর কোন ছায়াই দেখিনি তার মুখে স্বাস্থ্য ছিল অটুট—তাইতো আজও ভাবতে পারি না যে হঠাৎ এই দুঃসংবাদ বিশ্বাস কর্তে হ'বে আমায়।

জগতে হয়তো এমনি অঘটন প্রতিদিনই ঘটছে কিন্তু যে কথা চোখে দেখলেও মনে হয় ভুল দেখছি তা দেড় হাজার মাইল দূরে বসে শুধু কাণে শুনে কি করে মনকে বোঝাই? কিন্তু "সত্য কাহিনীর চেয়েও অদ্ভুত" এই কথা আজ বন্ধুবর প্রমাণ করে দিয়ে গেল।

ছেলেবেলা যদিও আমরা পাশা পাশি ছিলাম কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে জানতে পারিনি, কারণ অজয় কুমিল্লাতেই স্কুলে পড়ত আর আমি—আমায় যেতে হয়েছিল শান্তি নিকেতনে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে। কলকাতায় উভয়ের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ক্রমে ক্রমে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হল এবং সে বন্ধুত্ব আমাদের চিরকাল অটুট ছিল। আজ লিখতে বসে দৈনন্দিন কত ঘটনাই মনে পড়ছে। একত্রে কত কল্পনার জালই আমরা বুনেছি। কলকাতায় এক মেসে বসে একদিন স্থির হ'লো আমাদের এই ছুটিতে যেতে হবে কুমিল্লা এবং নাটক অভিনয় করতে হবে। ওর উৎসাহে পড়ে ইচ্ছা না থাকলেও যেতেই হল এবং 'ষোড়শী' নাটক আমরা মঞ্চস্থ করলাম। মফঃস্বলে ষ্টেজে যতটা সম্ভব তার চেয়েও ভাল হয়েছে বলে দর্শকবৃন্দ সকলে সমস্বরে স্বীকার করেন এবং সাফল্যের জয়মাল্য পেল অজয় জীবানন্দের ভূমিকায়। অভিনয়ে যেমন ছিল ওর গভীর আগ্রহ তেমনি অভিনয়ের ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। আজও আমার ওর অভিনীত বহু ভূমিকা চোখের ওপর ভাসছে। সেদিন অভিনয় ছিল আমাদের নিছক সখের ব্যাপার, কোনদিন ভাবতেও পারিনি যে এই হবে আমাদের পেশা। কুমিল্লায় দুই বৎসর একসংগে আমরা ছিলাম এবং প্রতি সকাল সন্ধ্যায় এবং প্রায় দিন রাতের মধ্যে ছাড়াছাড়ি আমাদের বিশেষ হত না।

তার পরে একদিন আমি চলে এলাম কলকাতায়। চিত্রজগতে সেই হল আমার প্রথম হাতে খড়ি। সেদিনও অজয়ের ছিল সবচেয়ে বেশী উৎসাহ। বলেছিল, তুই

নিশ্চয়ই সফল হবি এবং পরে আমাদেরও ডেকে আনিস। কথা দিয়েছিলাম—প্রথম সুযোগেই আমি ডেকে পাঠাবো এবং তখন যেন বন্ধুকে নিরাশ করিস না। নিরাশ ও করেনি কখনও। ওটা ছিল নির্বাক যুগের। তারপর চার বছর বাদে সবাক যুগে সুযোগ এল অর্থাৎ আমি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র-ভাবে ছবি তোলবার সুযোগ পেলাম। অজয়কে লিখলাম। ও এল—আমি বললাম, গান লিখতে হবে ভাই আমার ছবির জন্যে। সেদিন চিত্র-জগতে অজয় ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত—নবাগত, কাজেই প্রযোজককে বোঝাতে সময় নিয়েছিল। সেদিন বলেছিলাম, যে আজ হয়ত ভয় পাচ্ছেন কিন্তু একদিন আসবে এবং সেও বেশী দিন নয় যেদিন আপনারা সবাই ডেকে নেবেন অজয় ভট্টাচার্যকে গান লেখাবার জন্যে।

আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস সফল হ'তে বেশী দিন লাগেনি, চিত্রজগত মুখরিত হ'য়ে উঠলো অজয়ের প্রশংসায়। ও হল প্রসিদ্ধ—আমার হল সবচেয়ে বেশী আনন্দ। এবং নিজেকে ধন্য মনে করছি, এইভেবে যে চিত্রজগতে অজয়কে প্রথম পরিচয় করি আমি।

তারপর ক্রমে ক্রমে চিত্রনাট্য লেখক হিসাবে ও পরে পরিচালক হিসাবেও অজয় প্রসিদ্ধি লাভ করল। ওর 'ছদ্ম-বেশী' নতুন ছবি শুনতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর হ'য়েছে। যখন গৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহন করবার সময় এল ভগবান টেনে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। আমাদের কাছে ভগবানের এই কাজ নিষ্ঠুরতাই বলে মনে হচ্ছে কিন্তু হয়তো তিনি এমনি করেই তাঁর আশীষ পাঠান। আমাদের দুঃখ যে অত্যন্ত প্রিয়জনকে হারালাম। চিত্রজগত হারাল একজন বিশিষ্ট শিল্পী, স্ত্রী হারালো স্বামী, পুত্র পিতা, আমরা হারালাম বন্ধু। কিন্তু যে গেল সে ভাগ্যবান, সগৌরবে গেল, অগৌরবের গ্লানির ভয় রইল না তার। দুর্ভাগা আমরা বেঁচে রইলাম দুঃখ কষ্ট সব কিছুর মধ্যে। তবুও নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পাচ্ছি না। নিজের মনকে বোঝাতে পাচ্ছি না এই ভেবে যে কেন—কি প্রয়োজন ছিল ভগবানের এমনি ভাবে আমাদের বুকে নিষ্ঠুর আঘাত হানবার! তবুও আবার তাঁর কাছেই প্রার্থনা কর্তে হয়—প্রভু শান্তি দিও ওর আত্মাকে—প্রবোধ দিও আমাদের—শক্তি দাও, যেন প্রিয় বন্ধুর বিয়োগ ব্যথা সইতে পারি।

যে কথা পড়ে মনে

—ধীরাজ ভট্টাচার্য—

[স্বর্গত দুর্গাদাস ও জ্যোতিপ্রকাশের পরই ধীরাজ ভট্টাচার্যকে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রিয়দর্শন নট বলে যেমনি ক্যামেরার চোখ স্বীকার করবে—তেমনি আমারও বিশ্বাস। জ্যাক গিলবার্ট—টাইরণ পাওয়ারের থেকে কম প্রতিভা নিয়ে ধীরাজ বাবু পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেননি। অজয় বাবুর ভিতর তিনি যে রসের সন্ধান পেয়েছিলেন এখানে—সেকথাই উল্লেখ করেছেন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে]

পরিচয় জীবনে নানা ভাবে নানা লোকের সঙ্গে হয়েছে। এমনও হয়েছে, তার সঙ্গে বহুদিনের আলাপ হঠাৎ শুনলাম সে আর নেই—পাণটায় একটা মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল—কিছুদিন বাদে দেখলাম তার স্মৃতি বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে—চেষ্টা করেও খুঁজে পাই না। আবার এও দেখেছি হয়তো খুব অল্পদিনের আলাপ—কিন্তু খুঁটি-নাটি ঘটনায় মনে পড়ে তারই কথা—। আমার জীবনে ঐ অল্পদিনের পরিচয়ের স্মৃতি খুব বেশী না থাকলেও অজয় ভট্টাচার্যের অমর স্মৃতি ধ্রুব তারার মত আমার মনের আকাশে চিরদিন ফুটে থাকবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি।

অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়—মাত্র দু' বছর কি আড়াই বছর হবে, তার আগে তাঁর রচিত গান রেকর্ড, রেডিও ও ফিল্মে শুনে মুগ্ধ হয়ে—কতবার ভেবেছি—যদি লোকটার সঙ্গে আলাপ হত! তাঁর রচিত গান "তুমিও বঁধু জান, কাঁদিছে কেন আঁখি" শুনে এতদূর মুগ্ধ ও বিচলিত হয়েছিলাম যে তখনিই অনুসন্ধান করে জানলাম কে গানটী লিখেছে। যাক্ তাঁর গান সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি বসিনি। বাংলা দেশে আজ আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে তাঁর রচিত গান তাঁকে অমর করে রাখবে।

অল্পদিনের পরিচয়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আর একটা দিক আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল সেটা হচ্ছে তাঁর sense of humour—রসবোধ। যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশেছেন তাঁরা এ জিনিষটা ধারণা করতেও পারবেন না। ঐ নির্বিরোধ স্বল্প ভাষী লোকটীর মধ্যে এমন একটা মার্জিত রসবোধ লুকিয়েছিল যা বাইরে থেকে বোঝা যেত না। মজলিসে, আসরে বা আড্ডায় নানা সরস আলোচনা আমাদের হয়ে থাকে—কিন্তু অজয় ভট্টাচার্য সেখানে উপস্থিত থাকলে মনে হত—আজকের সময়টা বেশ ভাল ভাবে কাটবে।

রসিক লোক অনেক আছেন—কিন্তু তাঁরা ছ্যাবলামির দিকেই একটু বেশী ঝোঁকেন। অজয় ভট্টাচার্যের রসিকতায় ছিল উচ্চ শিক্ষার ছাপ—চট্ করে বোঝা যেত না কিন্তু বুঝ্‌লে—তার রেশ অনেকদিন মনে থাকত। রসবোধ বা sense of humour সম্বন্ধে এত কথা লিখলাম কারণ এর মধ্যে দিয়েই ঐ প্রতিভাধর রসিক ও কবির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশবার সুযোগ হয়েছিল।

আজ অজয়দা নেই—কিন্তু আছে আমাদের নিয়মিত মজলিস, আসর ও আড্ডা—যেখানে রস আলোচনার অভাব নেই—হাঁসিও খুব, কিন্তু তারই মধ্যে হঠাৎ যেন হাঁসি থেমে যায়, ছোট্ট একটী নিঃশ্বাস অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসে, মনে হয়—অজয়দা যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকতেন……।

স্মরণে

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়—

[পরিণীতা এবং শেষরক্ষা (মুক্তি প্রতীক্ষিত) চিত্রের পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোধ্যায় অজয় বাবুর সহপাঠী। কর্মজীবনে এক সংগে না হলেও—একই পথে তারা যাত্রা সুরু করেছিলেন। পরিচালক, সুরশিল্পী এদের অর্ডার-মাফিক গান রচনা করে দিয়েও অজয় বাবু নিজের বৈশিষ্ট্য কেমন ভাবে বজায় রাখতে পারতেন পশুতি বাবুর 'স্মরণে' সেই কথারই সাক্ষ্য দেবে]

১৯২৭ কি ২৮ সালের কথা। বাঙলায় এম্-এ, পড়ি। এবং সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিকের পাতায় থিয়েটার-বায়োস্কোপের সমালোচনা প্রসঙ্গে কলমবাজি করি।—ক্লাশে আমার ঠিক ডাইনে যে-ছেলেটি রোজই বসত' এবং অবসর-মুহূর্তে যার সঙ্গে আমি সব থেকে বেশী কথা কইতুম, সে হচ্ছে—অজয়। কথায় কথায় জানতে পেরেছিলুম, অজয়ও অল্পবিস্তর সাহিত্যচর্চা ক'রে থাকে এবং গান ও কবিতা লেখার দিকে তার বেশী ঝোঁক। একদিন অজয়কে বললুম, নজরুল একখানা বেশ চমৎকার গান লিখেছে—কাল রেকর্ডে শুনলুম। কি গান?—অজয় জিজ্ঞেস করলে। আমি কখনই গান গাইতে জানি না, যদিও অন্য পাঁচজনেরই মতো গান শুনতে খুবই ভালবাসি। কিন্তু গানের লাইন না গাইলে মনে পড়া শক্ত। তাই অজয়কে শোনাবার জন্যে আমি বেসুরো গলায় গুন্‌গুন্ ক'রে গাইলুম,

"হাস্‌নুহানা আজ নিরেলায় ফুটলি কেন আপন মনে?
ফুল্‌দরদী তোর সে বঁধু আসবে না আর ফুল-কাননে।"

ইত্যাদি। গান শুনে অজয় মুচকি হাসল। আমি বললুম, ভাই, গাইতে পারি না-তা কি করব বল'! চোখ দুটিকে ভ্রূ কুচ্‌কে বড়ো ক'রে অজয় বল্‌লে—না, সেজন্যে হাসিনি। তবে?—গানখানা নজরুলের লেখা নয়। বলো কি?—তাহ'লে এমন লেখা কে লিখল?—আমি হে-আমি।—তুমি? তুমি এই গান লিখেছ? রেকর্ডে তোমারই লেখা গান শুনলুম? অজয় ঘাড় নেড়ে এক পাশের ঠোঁট বেঁকিয়ে তার স্বভাবসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জানালে—হ্যাঁ।—

এম্, এ, পাশ করবার পর অজয় বোধ হয় দেশেই চ'লে গেল এবং কিছু দিনের জন্যে তার আর কোনো খবরাখবর পাইনি। তারপর হঠাৎ একদিন কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বাড়ী শচীন কর্তা (কুমার শ্রীশচীন্দ্র দেববর্ম্মণ) মারফত অজয়ের খবর পেলুম।—কর্তা তখন রেকর্ডে এবং সভা-সমিতি-আসরে গেয়ে অজয়ের লেখা গানকে জনপ্রিয় ক'রে তুলছেন। লোকে ব'লতে সুরু করেছে, গান লেখে বটে অজয় ভট্টাচার্যি। আমি থাকি বাগবাজারে আর অজয় তখন থাকত' কালীঘাট-টালিগঞ্জ এলাকায়। তবুও মধ্যেমিশেলে দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটত। এরপর আমি যখন নিউ থিয়েটার্সে সহকারী-পরিচালক হিসেবে কাজ করি, তখন প্রধানতঃ বড়ুয়া-সায়েব এবং ফণী মজুমদারের মধ্যস্থতায় অজয় এল নিউ থিয়েটার্সের বিভিন্ন ছবিতে পরিচালকদের চাহিদামাফিক গান লেখবার জন্যে। আমাদের আজও পর্যন্ত এই ধারনাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, গান না হ'লে ছবি হয় না—ছবির ভিতর গান থাকা চাই-ই চাই। বাঙলা ছবিতে গান লেখবার জন্যে অজয় ক্রমেই হয়ে উঠল—একেবারে যাকে বলে—Ever-ready machine, পরিচালকের প্রয়োজন-অনুযায়ী এমন মধুর গান লিখতে আজও অবধি আর একটি ওস্তাদকে খুঁজে পেলুম না।—পরিচালকেরা আজকাল ছবির মধ্যে প্রায়ই দু'একখানা ক'রে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের গানের তুলনা নেই। কিন্তু তাঁর গান তিনি রচনা করেছেন নিজের খেয়ালে, মনের স্ফূর্তিতে—কোন চিত্র-পরিচালকের অর্ডার অনুসারে তাঁকে গান বাঁধতে হয় নি।—কাজেই তাঁর গানকে ছবির ভিতর সন্নিবেশিত

ক'রতে হ'লে অনেক সময়ে পরিচালকদের তাঁর গানকে ভেবে ঘটনা সাজাতে হয় বা ঘটনার অল্পবিস্তর রদ-বদল ক'রতে হয়। কিন্তু অজয়কে পেয়ে পরিচালকদের কি সুবিধে হয়েছিল জানেন?—পরিচালক অজয়কে ডেকে বললেন—আমার ছবির এই জায়গায় গান চাই।—অজয় পরিচালকের সঙ্গে তাঁর গল্প, চরিত্র এবং ঘটনা-সংস্থান সম্পর্কে বেশ ভালো ক'রে situationগুলিকে হৃদয়ঙ্গম ক'রে ফেল্‌ল এবং দু'তিন দিনের ভিতরেই গান রচনা ক'রে নিয়ে এল।—পরিচালক হয়ত' পাঁচখানির মধ্যে তিনখানি পছন্দ ক'রলেন এবং দুখানি মঞ্জুর করলেন না। কুছ্ পরোয়া নেই। অজয় আবার দু'একদিনের ভিতরেই ঐ দু'খানি নামঞ্জুর গানের এক একখানির বদলে তিনখানি ক'রে গান নিয়ে হাজির হ'ল এবং বললে—এইবার নিন, যেখানা খুশী, বেছে নিন।—শুধু কি তাই?—সঙ্গীত পরিচালক হয়ত' একখানি গান সম্বন্ধে বললেন—অজয়বাবু আপনার গানখানা লেখা খুব ভালো হয়েছে, ঘটনা অনুযায়ী গানের ভাব এবং ভাষা চমৎকার মিলেছে, কিন্তু কি মুস্কিল হয়েছে জানেন—গানখানাকে ঠিক সুরে ফেলতে পারছি না,—ছবির এই জায়গাটায় যে সুরটি বেশ খাপ খায়, তার সঙ্গে আপনার গানের ছন্দ মিলছে না।—অজয়ের উৎসাহের কিছুমাত্র কমতি নেই। সে বল্‌লে—বেশ তো কি ছন্দ চান বলুন। সঙ্গীত পরিচালক ছন্দ বাৎলে দিলেন—অজয় সেই ছন্দ ধ'রেই গান রচনা ক'রে ফেল্‌ল। অবশ্য এ রকম ঘটনা অজয় বেশী হ'তে দেয়নি। কারণ, ছবির জন্যে গান লিখতে লিখতে সে শিগ্‌গিরই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল, কোন্ ঘটনায় কি ছন্দে গান বাঁধলে সঙ্গীত-পরিচালকদের আর খুঁৎখুঁৎ করবার অবকাশ থাকে না। আবার অমুক গাইয়ে অমুক গানের অমুক কথাটিকে বেশ ভালো ক'রে উচ্চারণ ক'রতে পারছেন না। তথাস্তু! কথাটি বদলে দিলুম। পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক এবং গাইয়ে—প্রত্যেকেরই প্রয়োজন বা আব্দারকে অজয় হাসিমুখে আমোল দিত এবং এই-রকম আমোল দিয়েও অজয় অনেক সময়েই অসামান্য সুন্দর গান লিখতে পারত—এইখানেই ছিল অজয়ের বিশেষত্ব। ছবির জন্যে অজয় আজ পর্যন্ত যত গান লিখেছে, সবই যে ভালো হয়েছে, তা নয়। কিন্তু এই না-ভালো হওয়ার জন্যে আমি অজয়কে ততখানি দায়ী করব না, যতখানি করব পরিচালককে। যে-পরিচালক যত বেশী ভালো ক'রে তাঁর ছবির ঘটনা অজয়কে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, তিনিই অজয়ের কাছ থেকে তত বেশী ভালো গান আদায় ক'রে নিতে পেরেছেন। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী ক'রতে পারেন পরিচালক নীতীন বসু।

অজয়ের আকস্মিক বিয়োগে বাঙলাদেশের পরিচালকদের গান লেখানোর দিক দিয়ে যে অসুবিধায় প'ড়তে হ'ল তা বলবার নয়। নিজে পরিচালক হিসেবে অজয় সবেমাত্র কাজ সুরু করেছিল বললেই হয়; তবুও বলব, তার দ্বিতীয় ছবি "ছদ্মবেশী" সকলকে স্বীকার ক'রতে বাধ্য ক'রবে যে, পরিচালক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সম্ভাবনা অজয়ের ভিতর ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলব, অজয়ের মৃত্যু আমাকে মুহ্যমান ক'রে ফেলেছে। আজও পর্যন্ত আমি মনকে শক্ত ক'রে তার স্ত্রী এবং ফুলের মতো সুন্দর ছেলে ও মেয়েটির সামনে নিজেকে দাঁড় করাতে পারিনি। তাদের সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা খুঁজে বার করবার মতো অবস্থা আমার নয়।

বাতায়ন ঃ এই ছবিখানির সঙ্গে এর পরিচালক পরলোকগত অজয় ভট্টাচার্যের স্মৃতি চিরদিন বিজড়িত থাকবে। যে চিত্রখানিকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন তার মুক্তি তিনি দেখে যাবার সুযোগ পাননি। কারণ কালের আহ্বানে তার পূর্বেই তাঁকে এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়েছে। আজ এই ছবিখানির আলোচনায় আমাদের বিশেষভাবে তাঁকেই মনে পড়ছে। যে-হাসির প্রস্রবণ এ ছবিতে বহে গেছে তা যে তাঁর কত বড় শিল্পী-মনের পরিচায়ক, এ সংবাদ তাঁকে আর আমাদের জানাবার উপায় নাই।"

সসৌরবে: চলিতেছে !

*

এম্পায়ার টকির পরবর্তী চিত্রসূচী:

মিনার্ভা মুভিটোনের

ভক্ত রায়দাস

শ্রেঃ ললিতা পাওয়ার, পরেশ বন্দ্যোঃ

প্রভাত পিক্‌চার্সের

রাম শাস্ত্রী

শ্রেঃ কিশোর-অভিনেতা রাম মারাঠে

পাঞ্চোলী আর্টের

শিরিঁ ফরহাদ

শ্রেঃ রাগিণী ও জয়ন্ত

প্রধান পিক্‌চার্সের

দাসী

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ছবি

পরিবেষণা: এম্পায়ার টকি ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ৯৮-ই সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু (সাউথ) কলিকাতা

অজয় স্মৃতি

সাবিত্রিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

[কবি হিসাবে শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের নাম কারোর কাছে অবিদিত নেই। মানুষ হিসাবে—কবি হিসাবে অজয় বাবু কত বড় ছিলেন—তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যেয়ে সাবিত্রী বাবু সেই কথারই উল্লেখ করেছেন]

অজয় বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় "পূর্ণ-থিয়েটার"এর মজলিসে। গাতলা ছিপ্‌ ছিপে গড়ন—দীপ্ত বুদ্ধি তাঁর দু' চোখে এবং সরল হাস্য ও কোমল চাহনির মধ্যে ফুটে উঠ্‌ছে উদার বন্ধুত্ব ও প্রীতির সহজ আমন্ত্রণ— ; যেন অনেক দিনের পরিচয় ও সৌহার্দ্য, এমনি ভাবেই তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বল্‌লেন—চিনি আপনাকে, দেখাও হয় প্রায়, পরিচয় করতেও ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মত কাউকে হাতের গোড়ায় পাইনি—। অজয় বাবুর গান মনের মধ্যে বহুদিন গুণ গুণ করে গেয়েছি—আজ গীতিকারকে দেখে মনটা ভারী খুসী হ'ল। তারপর অজয় বাবুর সঙ্গে বহুবার দেখাশুনা হয়েছে, সাহিত্য আলোচনা হয়েছে—ফিল্মের কথা, গান রচনার কথা নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে নিবিড় বান্ধবতা গড়ে উঠেছিল।

অজয় বাবুর সঙ্গে পরিচিত হ'বার পর কিছুদিনের মধ্যে ব্যক্তি হিসাবে সব চাইতে আমাকে যেটা গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল সেটা হচ্ছে তাঁর উদার মনোভাব—কাব্যের প্রতি, কবিদের প্রতি, সমাজের প্রতি। কোনো কবির কবিতা ভাল লাগ্‌লে এমন মন খুলে প্রশংসা ক'র্‌তে খুব কম কবিকেই দেখেছি। অজয় বাবু বহু বিজ্ঞাপিত 'ক্যমুনিষ্ট' কবি ছিলেন না অর্থাৎ তিনি কোনো মার্কামারা দলের কবি ছিলেন না, কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের আসল জায়গায় তাঁর প্রাণের দরদ ছিল এবং তিনি দেশের কুলি মজুর, অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত জনগনের দুঃখ বিড়ম্বনা নিয়ে, তাদের আগামী দিনের উজ্জল ভবিষ্যতের কথা শুনিয়ে যে সকল কবিতা লিখেছেন তার সংখ্যা অল্প হলেও তার মধ্যে যে গভীর সমবেদনা ও অনুভূতি তিনি রেখে গেছেন—তার সত্যকার মূল্য যেন আমরা দিতে পারি।

গীতিকার হিসাবে অজয় বাবুর পরিচয় বাঙলা দেশময় তাঁর গানে গানে ছড়িয়ে আছে—নজ্‌রুলের গানে যেমন বাঙলা দেশের গীতি-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে—অজয় বাবুর গান গুলিও তেমনি নানা ফুলের নানা রঙের মালায় বঙ্গজননীর পূজার বেদীকে সুশোভিত করে রাখবে। অজয় বাবু নিজে ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন,—তাই তাঁর গানে আমরা যেমন পাই ভাষার পারিপাট্য, তেমনি পাই গভীর অনুভূতির অপূর্ব আবেদন। এইজন্যই তাঁর গান বাঙলা দেশে এত প্রিয় হয়ে উঠেছে।

অজয় বাবু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আর একটি কথা আমার মনে হয়। তাঁর স্বভাবে যেমন মাধুর্য ছিল, কোমলতা ছিল, কারুণ্য ছিল তেমনি একটা ঋজু, দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্ব ছিল তা'র চরিত্রে। এই চরিত্র দেখে আমার মনে হয়েছিল—সত্যভাষণে স্পষ্ট ভাষণে অজয় বাবু নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত নন।

অজয় বাবুর মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক—তাঁর মৃত্যুর তিন চার দিন আগেই আমার সঙ্গে ধর্মতলার ট্রামে দেখা। দেখ্‌লাম যেন কেমন শুষ্কভাব। বল্‌লেন—সর্দি ইত্যাদিতে শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। তার পরই মৃত্যুর পরের দিন আমার প্রতিবেশী তার একজন নিকট আত্মীয়ের কাছে এই নিদারুণ খবর পাই। আমার বড় ছেলেটি

তাঁর কাছে 'তীর্থপতি' স্কুলে পড়েছিল খবরটা শুনে তাকে বেশ বিচলিত ও দুঃখিত দেখে মনে হ'ল শিক্ষক হিসাবে তিনি ছাত্রদের হৃদয় অধিকার করেছিলেন।

রাস্তায় বের হলেই প্রাচীর গাত্রে অজয় বাবুর 'ছদ্মবেশী'র বিজ্ঞাপন দেখ্‌তে পাচ্ছি—প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ছে। সহরের সিনেমায় তার "ছদ্মবেশী" দেখতে অগনিত নরনারীর ভীড় হচ্ছে—তিনি বেঁচে থাকলে এতে শ্লাঘা বোধ করতেন নিশ্চয়ই কিন্তু আমরা আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসপরায়ণ,—তাই মনে হয় তিনিও আজ ছদ্মবেশে তাঁর হাতের সৃষ্টির বাইরের রূপটি দেখে আনন্দিত হচ্ছেন।

মৃত্যু কে চায়? অজয় বাবুর বয়সই বা কি হয়েছিল? —জীবনের আরম্ভ বলা যেতে পারে। প্রশংসা ও গৌরব তাঁর আরো অধিক প্রাপ্য ছিল—বেঁচে থাকলে তা পেতেনও কিন্তু তা আর হ'ল না। অজয় বাবু তাঁর ছেলেটিকে প্রায়ই সঙ্গে করে বেড়াতেন—আজ তার কথাটাই কেবল ঘুরে ঘুরে মনে পড়ছে। সে কি তার বাবাকে ভুলতে পারবে?

যে যাবার সে যায় গো চলে
দীপ নিবে যায় যাওয়ার সাথে
রইল যারা তাদের ব্যথা
গুমরে মরে গভীর রাতে।

অজয় স্মরণে

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

[শ্রীযুক্তা ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাতে লিখে ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছেন। রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের কাছেও এঁর নাম অপরিচিত নয়। কলম্বিয়া পিকচার্সের শ্রীযুক্ত এন, সি লাহিড়ী এর পিতা। এবং স্বামী শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী ফিল্ম এ্যাডভাইসারী বোর্ডের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গীতিকার ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্যকে নিয়েই তিনি এখানে আলোচনা করেছেন।]

বিশ্বের আকুলতা বুকে নিয়ে "ছদ্মবেশীর" মুক্তি প্রতীক্ষায় ছিলুম। তরুণ পরিচালক কবি অজয় বাবুর সার্থকতায় দেশ ভরে উঠবে। আমরা কণ্ঠ খুলে জানাবো অভিনন্দন, মনে ছিল এই আশা। বাংলা চলচ্চিত্রে হাস্যরসাত্মক ছবি তোলার দিকে কেউই দৃষ্টি দেন না অথচ এই কমেডির ছবি জনসাধারণকে কতখানি আনন্দ দানে সমর্থ, চিত্রব্যবসায়ী হয়েও সে কথা তাঁরা জানেন বলে মনে হয় না। এই উদাসীন সিনেমা জগতে অজয়বাবুর ছদ্মবেশী বইখানি নির্বাচনের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দেখে আমরা সত্যই আশান্বিত হয়েছিলুম এই ভেবে যে, এইবার বাংলার চিত্ররাজ্যে যুগান্তর আসবে। কিন্তু বাংলার ও বাঙ্গালীর অশেষ দুর্ভাগ্য যে পূর্বাকাশে রক্তিমাভ—সে দেখল, কিন্তু সূর্যোদয় দেখা তার ভাগ্যে ঘটে উঠল না। গীতকার কবি অজয়বাবু অত্যন্ত অসময়ে সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন।

"আমি বন বুলবুল গাহি গান" গানটী শুনলেই তাঁর কথা মনে পড়ে যায়। সত্যই সিনেমার সঙ্গীতকুঞ্জে তিনি নিজেই ছিলেন এক সমকক্ষহীন বুলবুল। কণ্ঠে তার সুরের স্থলে ধ্বনিত হোত বাণী। সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথ ও কাজীনজরুল ইসলামের পরেই তাঁর নাম করা চলে। প্রথমে তিনি গীতকার রূপেই আমাদের সামনে উপস্থিত হন। বাংলাদেশে খুব কম লোক আছেন যারা তাঁর গান পছন্দ না করেন। (অবিশ্যি যারা সিনেমা দেখে না তাদের কথা আমি বাদ দিয়ে বলছি) তাঁর গানের কথাগুলির মধ্যে এমন সহজ, সরল, সূক্ষ্ম একটী রসবোধ সর্বদা জাগ্রত থাকে, যা অতি সহজেই মানুষের চিত্ত স্পর্শ করতে সমর্থ হয়। তাই তার গান সর্বসাধারণের নিকট এত প্রিয়। প্রণয়মূলক গান অনেকই শোনা যায়। কিন্তু তার আবেদনের ভাষা দক্ষ শিল্পীর হাতে না পড়লে তার রূপ বিকৃত হয়ে যায়।

যেমন যে প্রেম গোপনতার আড়ালে, অথচ অতি সরল পথে আত্মপ্রকাশ করে, সেই প্রেমই সকলের নিকট সুন্দর ও মধুর রূপে প্রতিভাত হয়। তাই প্রকৃতির নিয়মে রাত্রিই হয়েছে প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের শ্রেষ্ঠ লগ্ন। কিন্তু যে প্রেম দিনের আলোয় মুখরতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তার রূপ সুন্দর হলেও সে সাধারণের গ্রহণ যোগ্য নয়। সেই রকম গানের বেলাতেও এই কথা বলা চলে। অজয় বাবুর গানের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রেমের মত একটা তন্দ্রালু সজীবতার ভাব বিদ্যমান বলেই তা সকলের নিকট এত প্রিয়। মানুষ গানের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য, আনন্দ ও রসানুভূতি একসঙ্গে উপলব্ধি করে বলেই সঙ্গীত তার জীবনে এত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

"অজয়বাবুর গানগুলি আমাদের চিত্তের সকল শূন্য পাত্রগুলি পূর্ণ করে নববধূর মত সরম সঙ্কুচিত পদে হৃদয়ের পাশে এসে দাঁড়ায় বলেই আমরা তাকে এত ভালবাসি।

এবং এই জন্যই কবি এই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছেন। মানুষের জীবন চিরচঞ্চল, কিন্তু তার কীর্তি অবিনশ্বর। অজয়বাবুর পার্থিব দেহ পৃথিবী হতে চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছে সত্য কিন্তু তাঁর সার্থক সৃষ্টি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তিনি জগতে চির অমর হয়ে রইলেন। তাঁরই ভাষায় বলি—

"ওরে চঞ্চল,"
এই পথে এই যাওয়া
এই সুরে এই গাওয়া
শেষ নয় শেষ নয়
সে কথাটা বল্ (ওরে চঞ্চল)
হেথা তুই চির চেনা
এই ঘাটে লেনা-দেনা
ফুরাবে না ফুরাবে না,
শুধু চলাচল (ওরে চঞ্চল)।
স্বপ্নের কবি রে,
ধরণীরপথে পথে, এঁকে গেলি ছবি রে
স্বপ্নের ছবিরে—
(স্বপ্নের কবি রে)
যেথা তুই হবি হারা
সেথা সুর নহে সারা
তৃণে তৃণে তোরি প্রাণ
বীণে বীণে তোরই গান
'নাই' মাঝে চির থাকা
ছেড়ে দিয়ে চির রাখা
রে অতীত, অনাগতে হবি উজ্জ্বল।
(ওরে চঞ্চল)।

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের

উদয়ের পথে

মুক্তি-প্রতীক্ষায়
আমাদের সম্পূর্ণ পরিবেশনায়
এই বাংলা বাণীচিত্র
সর্ব বিষয়ে চির নূতনের
সৌষ্ঠব সমন্বিত হইবে।

অরোরা ফিল্ম্ কর্পোরেশন
১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

'রূপ-মঞ্চ'—বার্ষিক সংখ্যা

আগামী মাঘ মাসে 'রূপ-মঞ্চ' চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করবে। 'রূপ-মঞ্চের' এই জন্ম-বার্ষিকীতে পাঠক পাঠিকা তথা দর্শক সাধারণের শুভেচ্ছা প্রধান উৎসবোপকরণ—আশা করি রূপ-মঞ্চ তা থেকে বঞ্চিত হবে না। রূপ-মঞ্চের জন্ম বার্ষিকীতে পাঠক পাঠিকাদের যা বলবার আছে—আগামী ২৫শে জানুয়ারীর ভিতর সম্পাদকীয় বিভাগে এসে পৌছা চাই। বিনীত সম্পাদক : রূপ মঞ্চ।

কবি অজয় ভট্টাচার্য

—গোপাল ভৌমিক—

[আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি হিসাবে শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক ইতিপূর্বেই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। রূপ-মঞ্চের সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম সভ্যরূপে পাঠক সমাজের কাছে তাঁর নাম এবং লেখা অপরিচিত নয়। এঁর সাহচর্য এবং সহযোগিতা রূপ-মঞ্চকে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করে। অজয় বাবুর কবি প্রতিভা এবং মানুষ হিসাবে তিনি কত বড় ছিলেন শ্রীযুক্ত ভৌমিক এখানে সেই আলোচনাই করেছেন।]

যাঁর স্মৃতিকথা আজ লিখতে বসেছি, তাঁকে এত শীঘ্র আকস্মিক ভাবে হারাবো—সে কথা কোনদিন ভাবতে পারি নি। অনেক কবি এবং সাহিত্যিকের সঙ্গেই এ পর্যন্ত মিশবার সুযোগ পেয়েছি এবং অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিও। কিন্তু অজয়বাবুর মত প্রাণবান্ মানুষ দেখেছি খুব কম। এই প্রাণবান্ মানুষটির অফুরন্ত প্রাণশক্তি সহসা কি করে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিল, সে কথা ভেবে বিস্মিত হ'তে হয়। অজয়বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিন ব্যাপী ছিল না; মাত্র বছর তিনেক তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলাম। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাঁর সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর কবি-মনের যে বিরাট ব্যাপ্তি দেখেছিলাম—সেটা ভোলার জিনিস নয়। ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে মাত্র বছর তিনেক এলেও, তাঁকে দূর থেকে চিনতাম অনেকদিন—আমার কলেজ জীবনের গোড়া থেকে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা। আমি তখন বঙ্গবাসী কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি—থাকি ক্যানিং হোষ্টেল-এ বঙ্গবাসী কলেজে আই, এস্ সি পড়ার সময় অজয়বাবুও কিছুদিন ক্যানিং হোষ্টেলে ছিলেন। সেই থেকে ক্যানিং হোষ্টেলের প্রতি তাঁর দিনদিনই একটা গভীর মমত্ববোধ ছিল। আমাদের হোষ্টেলে ছাত্রদের কোন উৎসবাদি থাকলে, অজয়বাবু যথারীতি নিমন্ত্রিত হতেন এবং নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। বিশেষ করে শারদীয়া উৎসব এবং সরস্বতী পূজো ছাত্রমহলে প্রচুর আনন্দের বার্তা বয়ে আনত। ছাত্ররা এই দুটি উৎসব উপলক্ষে প্রচুর ভোজ এবং সঙ্গীতাদি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করত। এই সঙ্গীতের আসরেই আমি সর্বপ্রথম অজয় ভট্টাচার্যকে দেখেছিলাম। কুমার শচীন দেব বর্মা, কে, এল, সায়গল, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শিল্পীরা হোষ্টেলের সঙ্গীত আসরের শোভা বর্ধন করতেন। তাঁদের সঙ্গে দেখতাম একজন প্রিয়দর্শন দীর্ঘকায় সৌম্য শান্ত ভদ্রলোক গলায় চাদর ঝুলিয়ে বসে থাকতেন। তখন বয়েস অল্প ছিল সাহস করে এঁদের কাছে এগিয়ে যেতাম না; দূর থেকে সঙ্গীত আসরের উদ্যোক্তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে এঁদের পরিচয় জেনে নিতাম। মনে আছে এমনি করে গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের পরিচয় জেনে একদিন বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিলাম! এই লোকটির রচিত গান আমাদের হৃদয়কে দুলিয়ে দিয়ে যায়—আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই। সেদিনের সেই অপূর্ব অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দেওয়া প্রায় অসম্ভব! একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। হোষ্টেলের একটি কক্ষে ছোট খাটো একটা গানের আসর বসেছে—গান গাইছেন পাহাড়ী সান্যাল। কি একটা গানের পরে সবাই পাহাড়ী সান্যালের খুব প্রশংসা করল: তখন তিনি সানন্দে তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট স্মিতমুখ অজয়বাবুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন: "এ গানের অধিকাংশ কৃতিত্বই রচয়িতা অজয়বাবুর প্রাপ্য!" সেদিন বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলাম এই লোকটি এত সুন্দর গান লেখেন কি ভাবে? তারপর বহুদিন বহুরূপে তাঁকে হোষ্টেলের উৎসবাদিতে যোগ দিতে দেখেছি। আমরা তখন সবে মাত্র সাহিত্য-প্রার্থী—দু'একটি সাময়িক পত্রিকায় আমার দু'একটি লেখা সবে বেরুনো সুরু করেছে। ইচ্ছা হ'ত অজয়বাবুর সঙ্গে পরিচয় করি—কিন্তু সাহসে কুলোত না। হোষ্টেলের উৎসবে নিমন্ত্রণ করা উপলক্ষে কয়েকবার তাঁর

কাড়ীতেও গেছি। তিনি মুখ দেখে আমাকে চিনতেন, জানতেন যে আমি ক্যানিং হোষ্টেলের ছাত্র—এই পর্যন্ত।

অজয়বাবুর সঙ্গীত রচনার যে একটা অপূর্ব স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল তার একটা চমৎকার নিদর্শন দেখেছিলাম ক্যানিং হোষ্টেল জীবনে। সে সময় আমাদের হোষ্টেলের ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে চাঁদুদা। তাঁর সঙ্গে গায়ক এবং চিত্রশিল্পীদের অনেকের খাতির ছিল। চাঁদুদা আমার লেখার খুব তারিফ করতেন এবং আমাকে একটু বিশেষ স্নেহচক্ষে দেখতেন। মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ী সান্যাল, সায়গল প্রভৃতির বাড়ীতেও যেতেন। একদিন হোষ্টেলের একটা উৎসব শেষে চাঁদুদা অজয়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় আমাকেও ডেকে নিলেন। তখন রাত প্রায় ১০টা। আমরা হাঁটতে হাঁটতে কানাই ধর লেনে (মির্জাপুর ষ্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে) প্রসিদ্ধ ঠুংরী গায়ক শচীন দাস মতিলালের বাড়ীতে গেলাম। তিনি তখন হারমোনিয়ম নিয়ে কি একটা সুর সাধ্‌ছিলেন। অজয়বাবু বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে সেই সুর শুনে তখনই একটা বাংলা গান লিখে ফেললেন এবং শচীন দাস মতিলাল তখনই সেই গানটিতে সুর সংযোগ করে আমাদের শুনিয়ে দিলেন। গীতিকার অজয়বাবুর এই অপূর্ব নৈপুণ্য দেখে সেদিন যে কতটা মুগ্ধ হয়েছিলাম—আজ সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। শুনেছি কাজী নজরুল ইস্‌লাম এমনি ভাবে গান কিংবা কবিতা লিখতে পারেন, আর চোখের সামনে উদাহরণ দেখেছিলাম অজয়বাবুর।

এমনি করে ছাত্র-জীবনে অজয়বাবুর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমি তাঁর সাথে পরিচয়ের সেতু গ'ড়ে তুলেছিলাম। আমার নিজের নাম জাহির করে কখনও তাঁর সাথে পরিচয় করার চেষ্টা করি নি; তবে প্রথম থেকেই তাঁর প্রাণ খোলা মধুর ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগত। কেন জানি না ক্যানিং হোষ্টেল জীবনের শেষ দিকে দেখতাম অজয়বাবু আর আমাদের উৎসবাদিতে যেতেন না। ইত্যবসরে সঙ্গীত রচয়িতা এবং কবি হিসাবে তাঁর নাম যথেষ্ট ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাদিতে তাঁর রচনা পেলেই সাগ্রহে পাঠ করতাম এবং ভাল লাগ্‌ত। প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও পরোক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠ্‌ছিল তার রচিত সাহিত্যের মারফৎ। তারপর অল্প ৪।৫ বছরের মধ্যে দেখেছি কবি অজয় ভট্টাচার্যের বিপুল সাফল্য: রেকর্ড্, রেডিও, চলচ্চিত্রের মারফৎ তাঁর রচিত গান বাংলার আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে রবীন্দ্রোত্তর যুগে গীতিকার হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের পরে এত বেশী জনপ্রিয়তা আর কারও ভাগ্যে জুটেছে বলে আমাদের জানা নেই। জনপ্রিয়তা লেখকের রচনার শিল্পোৎকর্ষের মাপকাঠি না হলেও, জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে লেখক দেশবাসিদের সঙ্গে তাঁর যোগ-সূত্র স্থাপন করতে পেরেছেন। অজয়বাবু সঙ্গীতপ্রিয় বাঙালীদের মর্ম স্পর্শ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। কবি কিংবা গীতিকারের পক্ষে এটা কি কম সাফল্যের কথা?

তাঁর রচিত সঙ্গীতের অভূতপূর্ব সাফল্যে অজয় বাবু কিন্তু কবিতা রচনা করা ছেড়ে দেননি। গীতিকাররূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সাথে সাথে তাঁর কবি-খ্যাতিও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। 'রাতের রূপকথা' নামক কাব্যগ্রন্থে আমরা দেখেছিলাম অজয়বাবুর রোমান্টিক কল্পনার অপূর্ব বিকাশ। বইয়ের নাম থেকেই কবির মানসিক অবস্থা সহজে অনুমেয়। প্রথম দিকে সব কবিরই যা হয়—অজয় বাবুর মধ্যেও সেই রোমান্টিক ভাব-বিলাসের বিকাশ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় কাব্যপুস্তক 'ঈগল' ও অন্যান্য কবিতায় দেখলাম কবির পরিবর্তনকামী বলিষ্ঠ

চিন্তাধারা। বাস্তব ঘাত-প্রতিঘাতের সংস্পর্শে এসে কবি নিজেকে এবং পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখতে সুরু করেছেন—ফুলের মধ্যে কীট আছে—এ সত্য আর তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারছে না। 'ঈগল্' ও অন্যান্য কবিতায় দেখি কবির সমাজ-চেতনার প্রকাশ কামনা: বাস্তবের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাঁর সুদূর-প্রসারী কল্পনাকে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে পুরোপুরি সার্থকতা তিনি লাভ করতে পারেননি—কেননা বাস্তব-বোধ-সঞ্জাত একটা নৈরাশ্যবোধ তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের দিকে তিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তাকাতে পারেননি—তাকিয়েছেন অনেকটা নৈরাশ্যবাদীর দৃষ্টিতে। ফলে একটা অন্তর্নিহিত করুণ সুর 'ঈগল্' ও অন্যান্য কবিতা'র প্রায় কবিতাই ছেয়ে আছে। পরে অবশ্য তিনি এই নৈরাশ্যবাদের মোহ কাটিয়ে তাঁর স্বাভাবিক সুস্থ সবল আশাবাদ ফিরে পেয়েছিলেন। যথাস্থানে সে কথা আলোচনা করব।

এতদিন পর্যন্ত অজয়বাবুর সঙ্গে আমার যে একপাক্ষিক পরিচয় ছিল, সে পরিচয় উভয়-পাক্ষিক হ'য়ে দাঁড়াল ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে—একটি সভা উপলক্ষে। এর কিছুদিন পূর্ব থেকে অজয় বাবুর ছোট ভাই সুপরিচিত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় 'নিরুক্ত' নামক কবিতার ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেছিলেন। শীঘ্রই আমি 'নিরুক্তে'র নিয়মিত লেখক-গোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরীর সম্পাদকত্বে এই সময় 'নিরুক্ত-সংগীতি' নামে একটি নতুন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানেরও সৃষ্টি হয়েছিল। ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাস-ভবনে 'নিরুক্ত-সংগীতির' প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। সেই অধিবেশনে সঞ্জয়বাবু অজয়বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার নিজের ত অনেক আগের থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা ছিল; কাজেই এই আলাপ শীঘ্র জমে' ওঠার ব্যাঘাত ঘটেনি। আর অজয়বাবু নিজে এত মিশুক ছিলেন যে, একবার কেউ তাঁর সংস্পর্শে এলে—তার পক্ষে দূরে যাওয়া ছিল মুস্‌কিল। আলাপের কিছুদিন পরের একটা ঘটনা বলছি—তখন আমার বেকার দশা—চাকরী খুঁজছি। সেই সময় সঞ্জয় বাবু আমাকে একদিন বললেন যে অজয় বাবুর এক বাল্য-বন্ধু বড় শিল্পপতি হয়েছেন—তাঁর ব্যাঙ্ক আছে, বীমা কোম্পানী এবং অন্যান্য আরও অনেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছে; অজয়বাবুর একটা চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলে চাকরী পাওয়া সম্ভব। সেই সময় এই ব্যাঙ্কে লোকের প্রয়োজন আছে বলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল। অতএব সাহিত্যিক পরিচয়ের সূত্র ধরে গিয়ে হাজির হলাম অজয় বাবুর কাছে। আমার বক্তব্য তাঁকে বলতেই তিনি বললেন: "আমি আপনাকে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি; তবে কাজ হবে কিনা জানি না।.....বিরাট লোক—আমার চিঠি গ্রাহ্য না-ও করতে পারে।" এই বলে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লিখে ব্যাঙ্ক মালিককে একখানি চিঠি দিলেন। সেই সঙ্গে আমাকে তাঁর নব-প্রকাশিত কবিতার বই "ঈগল ও অন্যান্য কবিতা" এক খণ্ড উপহার দিলেন। বাড়ীতে এসে কবিতাগুলো পড়ে চমকে উঠেছিলাম: 'রাতের রূপকথা'র রোমান্টিক কবি, কি কঠিন বাস্তববাদী হয়ে উঠেছেন! বস্তুতান্ত্রিকতা অনেক সময় নৈরাশ্যবাদের কাছ ঘেঁসে চলে গেছে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে 'পূর্বাশা' থেকে তাঁর যে 'সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা' নামক কাব্য-পুস্তক বেরিয়েছে আমার মনে হয় তার মধ্যেই অজয় বাবুর পরিণত কাব্য-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠদান সন্নিবদ্ধ রয়েছে। এই বইয়ের কবিতাগুলো পড়তে পড়তে তাঁর প্রগতিশীল কবি-মনের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। 'রাতের রূপকথা'র কবির কি বিরাট বিবর্তন! এ বিবর্তন সম্ভব

শুক্রবার
৪ঠা ফেব্রুয়ারী

প্রথমারম্ভ

অভিনব প্রণয়-যুদ্ধের
আনন্দঘন চিত্র

স্নেহপ্রভা ও
সাহু মোদক

অভিনীত নবযুগ চিত্রপটের সঙ্গীতবহুল
হাস্যচিত্র

লড়াই
কে
বাদ

পরিবেষক ঃ 'মানসাটা'

প্রত্যহ
২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-১৫টায়

নিউ সিনেমা

অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত চিত্র

নবীনের বিজয় :
পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে

ভূমিকায় ঃ
শাহ নওয়াজ, ডেভিড, প্রভা, মমতাজ আলি, ও সুরাইয়া,
একযোগে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হইতেছে

চিত্রা ও জ্যোতি

প্রত্যহ ২-৩০, ৫-৩০ ও ৮-১৫টায় প্রত্যহ ২-৩০, ৫ ৩০ ও ৮-৩০টায়

হয়েছিল তিনি খাঁটি কবি ছিলেন বলে। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন আধুনিক—কিন্তু তাঁর প্রেরণার মধ্যে কোথাও ফাঁকি ছিল না—কোথাও তিনি জোর করে দুর্বোধ্য কিংবা আধুনিক কবিতা লেখার প্রয়াস পান নি। তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে প্রাণের সহজ স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তিনি যে বামপন্থার আহ্বানে বিশ্বাস করতেন, তারই রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন 'সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা'য়। ছন্দোমাধুর্য, শব্দ-চয়ন, মানব প্রীতি এবং ভবিষ্যৎ-বিশ্বাসী সমাজ-সচেতনতায় প্রতিটি কবিতা সমুজ্জ্বল। তাঁর সর্বব্যাপী প্রেম এবং আশা-বাদের নমুনা স্বরূপ একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত না কোরে পারলুম না ঃ

"বুভুক্ষিত মানুষেরে হেরি আজ অমৃত-সন্তান,
ললাটে জ্বেলেছে তারা সর্বজয়ী রুদ্র বহ্নিরেখা,
নগরীর ক্লিন্ন ধূমে নিঃশেষিত যত অপমান
দানবের যন্ত্রপুরে প্রগল্‌ভ বসন্ত দিল দেখা।
উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে জীবনের অজস্র প্রকাশ
অতন্দ্র নয়ন মেলি দেখিলাম জনমের মত
নিষ্পেষিত আত্মা কহে মৃত্যু মোর নহে সর্বনাশ
নিরানন্দ অন্ধকারে উৎসবের দীপ জ্বলে কত!
আজ ভাবি দিতে পারি আপনারে নিঃশেষ করিয়া
ক্ষুদ্র ধূলিকণা তরে দিতে পারি প্রাণের সঞ্চয়,
মিলে যদি হলাহল তাই লবো ভৃঙ্গার ভরিয়া
ভালবাসি ধরণীরে সেই শুধু মোর পরিচয়।"

অজয়বাবুর সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখার আছে। সব লিখতে গেলে বর্তমান প্রবন্ধে কুলোবে না। তাঁর প্রগতি-শীল মনের সঙ্গে তাঁর চরিত্রে যে একটা বিরাট ঔদার্য ছিল সে কথা না বললে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হবে না। বৈষয়িক ব্যাপারে সাহিত্যিক-দের মন সাধারণতঃ উদার হলেও, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের চরিত্রে পরশ্রীকাতরতার প্রকাশ দেখা যায়। এক সাহিত্যিক সাধারণত অপর সাহিত্যিকের খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জনকে সুচক্ষে দেখেন না। অপরের সাহিত্য সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেন কম। অজয়বাবু ছিলেন এর ব্যতিক্রম। কারো লেখা ভাল লাগলে তিনি তাঁর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন—এমন কি সময় সময় তাঁর প্রশংসা মাত্রা পর্যন্ত ছেড়ে যেত। যেমন সাহিত্যে, চলচ্চিত্রেও ঠিক তেমনি। বাঙালীর সাহিত্য এবং বাঙালীর চলচ্চিত্রের উপর তাঁর ছিল আন্তরিক দরদ। বাংলা চিত্রশিল্পের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁকে দেখিয়ে দিলে, তিনি সেগুলো মেনে নিতেন। কিন্তু তবু তিনি বলতেন যে বাংলা চিত্র-শিল্পের সামনে সুমহান ভবিষ্যৎ পড়ে আছে—দুদিন আগে হোক, আর দুদিন পরে হোক বাংলা চিত্র তার যোগ্য সম্মান পাবেই। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর এই সুদৃঢ় আশাবাদ দেখেছি। (বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি তাঁর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি অনুবাদে পর্যন্ত হাত দিয়েছিলেন—প্রমাণ ওমর খৈয়ামের রুবাইৎ এবং 'Road Back'এর বাংলা অনুবাদ।) অজয় বাবু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। সাহিত্যের প্রাত্যহিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী। আমার সঙ্গে দেখা হলে—প্রায়ই দুজনে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হ'ত। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একদিন রাত্রিতে এস্‌প্ল্যানেড্‌ থেকে বালিগঞ্জ আসার ট্রামে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি সামনের একটা সিটে একা বসেছিলেন। আমাকে উঠতে দেখেই ডেকে নিয়ে পাশে বসালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজনে সাহিত্যালোচনায় মগ্ন হ'য়ে গেলাম। আলোচনা করতে করতে উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন ঃ "সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী লেখক নেই—একথা কে বলতে পারে? আমি সুবোধ ঘোষের

'পরশুরামের কুঠার' পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কি শক্তিশালী ভাষা আর কি অভিজ্ঞতার প্রসার! লেখার মধ্যে কোথাও একটু ফাঁকি নেই। বহুদিন বাংলা সাহিত্যে এমন সুন্দর গল্প পড়িনি।" অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি সুবোধ ঘোষের সাহিত্য-বিশ্লেষণ করে আমায় শোনালেন। তাঁর মত উদার মনে অন্য সাহিত্যিকের এতটা প্রশংসা করতে আমি খুব কম সাহিত্যিককেই দেখেছি। (তাঁর অকাল মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্র-জগৎ যেমন একজন একনিষ্ঠ সেবককে হারিয়েছে, তেমনই বাংলার সাহিত্যিক সমাজ হারিয়েছেন একজন অকৃত্রিম দরদী বন্ধু।) মৃত্যুকে জয় করে অজয় বাবু হয়ত তাঁর সৃষ্টির জোরে অদেহী হয়ে বেঁচে থাকবেন, কিন্তু আর কোনদিন তিনি দেহ ধারণ করে বাঙালীর সাহিত্য এবং তার চলচ্চিত্রের পক্ষ সমর্থন করতে আসবেন না। যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁরাই শুধু এই অপূরণীয় ক্ষতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

হ্যাভিল্যাণ্ড স্নো, ক্রীম ও পাউডার

রুচি সম্মত প্রসাধন দ্রব্যাদি

সুপরিচিতা সাহিত্যিক শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও প্রতিভা বসু বলেন :—

হ্যাভিল্যাণ্ড কেস্ পাউডার পিয়ারলেস কোয়ালিটী ব্যবহারে সন্তোষ লাভ করিয়াছি। দেশের মেয়েরা এই ধরণের বিদেশী প্রসাধনের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিলে দেশের শিল্পকে পুষ্ট এবং দেশের অর্থকে স্বদেশের ভাণ্ডারেই রক্ষা করিতে পারিবেন।

রাধারাণী দেবী

৭২।২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা।

হ্যাভিল্যাণ্ড ফেস্ পাউডার ব্যবহার করে অত্যন্ত সুখী হলাম। এর গুঁড়ো এত মিহি যে মুখে মাখ্‌লে চামড়ার উজ্জলতা বৃদ্ধি করে কিন্তু কোন উগ্রতা প্রকাশ পায় না।

প্রতিভা বসু

২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।

হ্যাভিল্যাণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্

কলিকাতা

সঞ্চয়

"শোকের বরষা দিন এসেছে আঁধারি'
ও ভাই গৃহস্থ চাষী ছেড়ে আয় বাড়ী।
ভিজিয়ে নরম হ'ল শুষ্ক নরু মন
এই বেলা শস্য তোর করেনে বপন।"

—রবীন্দ্রনাথ।

যে ব্যক্তি যত বেশী প্রস্তুত থাকিবে, জীবনে ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সে তত বেশী সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে।

আপনার উপার্জ্জনের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ জমাইবার জন্য নিয়মিত অভ্যাস করার চেয়ে, জীবনের বহু কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অধিকতর নিশ্চিত উপায় আর নাই।

এখন হইতে প্রতি সপ্তাহে যা কিছু পারেন তাহা যদি জমাইয়া যান তবে বৎসরকাল মধ্যেই দেখিতে পাইবেন যে, একটা মোটা টাকা আপনার জমিয়া গিয়াছে।

আপনার এই কার্য্য সুরু করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিতে দিন।

ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ

১২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ : কলেজ ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, খিদিরপুর, বর্দ্ধমান খুলনা ও বাগেরহাট।

অজয় ভট্টাচার্য

বীরেন দাশ

[শ্রীযুক্ত বীরেন দাশ সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তার প্রগতি-মনের পরিচয় দিয়ে অনেককেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হ'য়েছেন। বর্তমানে ভারত সরকারের ফিল্ম বিভাগে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের অধীনে তিনি কাজ করছেন। রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এর চেয়েও তার বড় পরিচয়, রূপ-মঞ্চের প্রতিনিধি স্বরূপ বম্বের চলচ্চিত্র মহলের সংবাদ তিনি সরবরাহ করে থাকেন। বম্বের শিল্পীদের কাছে রূপ-মঞ্চের জনপ্রিয়তার মূলে তার উদ্দীপনা ও সহযোগিতা অনেকখানি সাহায্য করে।]

বাংলা আজ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে পতিত। সহস্র সহস্র লোক দিনের পর দিন গৃহপালিত পশুর মত, অসহায় নিরুপায় মৃত্যু বরণ করছে। আজ যারা আছে, দু'মাস পরেও তারা বাঁচবে এমন ভরসা নেই। কিন্তু এই অবস্থায়ও এই ভেবে শান্তি পাই যে, আমাদের ধনদৌলত নেই বটে, কিন্তু কৃষ্টি আছে।

আমরা বরাবরই সরস্বতীকে প্রাধান্য দিয়েছি তাই আমরা নির্ধন। কিন্তু এ বললে বোধহয় প্রাদেশিকতা হয় না যে শিল্পকলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতে. বাংলা আজ ভারতের পুরোভাগে। বাঙ্গালীর এই জাতীয় সংস্কৃতির ভাবধারার অনেক বাহনের একজন ছিলেন, অজয় ভট্টাচার্য।

(অজয়বাবু একজন সত্যিকার কৃষ্টিবান পুরুষ ছিলেন। একাধারে সাহিত্যিক, কবি ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন।) সাহিত্যিক হিসাবে যত না লোক, সঙ্গীত-লেখক হিসাবে অজয়বাবু খ্যাতির উচ্চতম শিখরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক সময় নজরুল ইসলাম গান লিখে যশস্বী হয়েছিলেন। (নজরুলের পরে যাদের গান সব চাইতে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, বলা বাহুল্য, অজয়বাবু তাঁদের পুরোভাগে।)

অজয়বাবু বাংলার তরুণ মনের ভাবধারা গানের ভাষায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য মূলত ফিল্ম ও রেকর্ডের জন্য লিখতেন। কিন্তু ফিল্ম ও রেকর্ডের জন্য লিখলেই তা সস্তা হয়ে উঠবে, এমন কিছু কথা নেই। ফিল্মের জন্য লিখেও কত চমৎকার লেখা যায়, অজয়বাবুর গানই তার প্রমাণ।

প্রথম যৌবনে সাহিত্যিক, পরে ফিল্মের লেখক এবং পরিশেষে পরিচালক অবধি উঠে অজয়বাবু অকালে কালগ্রাসে পতিত হলেন। বেঁচে থাকলে হয়ত একদা তিনি বাংলা ফিল্ম-শিল্পের শ্রেষ্ঠ পরিচালক-লেখক হয়ে উঠতেন।

কিন্তু তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে, বাংলা গানের সব চাইতে বেশী ক্ষতি হল। সারা ভারত জুড়ে আজ যে বাংলা গানের এত জনপ্রিয়তা, তার মূলে যেমন বাঙ্গালী সুরকারের কেরামতি তেমনি গান লিখিয়েরও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা রয়েছে।

জানি, কালের মাপকাঠিতে আজ যা আধুনিক···কাল তা অনাধুনিক হয়ে উঠবে। কিন্তু নয়া বাংলা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা অজয়বাবুকে অনেক দিন মনে রাখবে।

ঠিক এই যুগেরই আদর্শ যেন

সেই কবে কালিদাস শকুন্তলাকে সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন কিন্তু মনে হয় আজকের দিনে নারীর কাছে যা আদর্শ এ ঠিক সেই চরিত্রটিই যেন। আজকের মত দিনে নারীর যেমনটি হওয়া দরকার শকুন্তলা যেন তারই হুবহু প্রতীক। আর রাজকমল কলামন্দিরের তোলা যে ছবিখানি সম্প্রতি মুক্তিলাভ ক'রেছে, ভারতবিশ্রুত পরিচালক শান্তারাম এই চরিত্রটি এমনি চমৎকার প্রাণবন্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন যে নারী মাত্রই দেখতে দেখতে অনুপ্রাণিত না হয়ে পারবেন না। পতি দিলে না ঠাঁই, পিতার ঘরেও আশ্রয় নিতে পারলে না সে, কিন্তু তবু নারী যে অবলা নয় সেই সত্যটি সমগ্র জগৎ সমক্ষে তুলে ধরার জন্য সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে একান্তই নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থায় স্বীয় চরিত্রবলে, অটল কর্তব্যপরায়ণতায় এবং সর্ব্বমুখী প্রতিভা-দীপ্তিতে নিজেকে সে সর্ব্বযুগের বরণীয়া নারীদের অন্যতমা ক'রে তুললো। তার জীবনে সব চেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত্ত এলো—যেদিন যে-সন্তানকে একা সে মাতৃস্নেহে, পিতৃঅভিভাবকত্বে এবং গুরুদীক্ষায় মানুষ ক'রেছিল সেই ভরত যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হ'লো, আর তারই নামানুসারে সৃষ্টি হ'লো এই ভারতবর্ষ। নারী হ'য়েও সে ভরতকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা ক'রে তুলেছিল, তাকে স্বাবলম্বী হ'তে শিখিয়েছিল, তাকে শিখিয়েছিল জগতে নিজের শক্তি ও সামর্থের ওপর ভর ক'রে দাঁড়াতে, পিতার নাম ভাঙিয়ে নয়। এই মহিমময়ী তেজস্বিনী রমণীর চরিত্রগাথা ভারতীয় নারী মাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রবে। 'শকুন্তলা' চরিত্রকে সর্ব্বজনের বরণীয় ক'রে তোলার জন্য রূপদাত্রী শ্রীমতী জয়শ্রীকে এবং সর্ব্বোপরি পরিচালক শান্তারামকে সকলেই আন্তরিক অভিবাদন না জানিয়ে পারবেন না। সত্যিই এমন চিত্র ও চরিত্র চিত্রণ ভারতীয় চিত্রজগতে অভূতপূর্ব্ব।

শকুন্তলা

প্যারাডাইসে চতুর্থ সপ্তাহ

প্রত্যহ ঃ ২, ৫ ও সন্ধ্যা ৮টায় :: অগ্রিম টিকিট ক্রয় করুন।

পরিবেশক ঃ কাপূরচাঁদ লিমিটেড ঃ কলিকাতা

শ্রীপার্থিবের সফর-বার্তা

ছদ্মবেশীর উদ্বোধন উৎসবে ডি, ল্যুক্স পিকচার্সের উদ্যোগে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের সভাপতিত্বে গীতিকার ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্যের স্মৃতি-তর্পণ।.....!

গত ১৫ই জানুয়ারী। বেলা ১১টা, ডি, ল্যুক্স পিকচার্সের কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ করলেন ছদ্মবেশী চিত্র দেখতে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই এরূপ সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ করে থাকেন তাই এ সম্পর্কে মনের কোন চাঞ্চল্য না থাকাই স্বাভাবিক কিন্তু এদিন—এদিনের ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ছদ্মবেশীর পরিচালকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে কর্তৃপক্ষ শিল্পী ও সুধী সমাজের অনেককেই আমন্ত্রণ করেছেন। এই শ্রদ্ধা নিবেদন করবার মহা সুযোগটী আমার মনে যে সাড়া এনে দিল—তা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলাম না। প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেই সামনে দৃষ্টি পড়লো—মৃত পরিচালকের একখানা প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। ওরই পাশে কয়েকখানা আসনে স্মৃতি পূজার হোতারা বসে আছেন।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সমাগত সুধী সমাজ থেকে করতালির দ্বারা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হ'লো। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি নিয়ে রূপ-মঞ্চ পত্রিকা ও বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত গোপাল ভৌমিক ও শ্রীযুক্ত কালিদাস ঘোষ মৃতের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করতে অগ্রসর হলেন—বাংলার এই মাসিক পত্রিকা ও জন প্রতিষ্ঠানটীর কর্তব্য পরায়ণতায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না—তাই তাদের অভিনন্দন জানাতে মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনি শোনা গেল। মনটা তখন অজয়ের স্মৃতিতে কানায় কানায় ভরতি—তবু রূপ-মঞ্চ এবং বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির একজন একনিষ্ঠ সেবীরূপে গর্ব অনুভব না করে পারলুম না।

নিউ থিয়েটার্সের প্রচার সচিব শ্রীযুক্ত সুবীরেন্দ্র সান্যাল পরিচালকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর বিভিন্নমুখীন প্রতিভার কথা উল্লেখ করে এক আবেগ-ময়ী ভাষায় বক্তৃতা করলেন। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থম থম করতে লাগলো।

বেতারের সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রকে সভাপতি কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। শ্রীযুক্ত ভদ্র মৃতের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ডি, লিউক্স পিকচার্সের কর্তৃপক্ষদের অশেষ ধন্যবাদ জানালেন। শ্রীযুক্ত ভদ্র বলতে লাগলেন, "কর্তৃপক্ষ এরূপ স্মৃতি সভার আয়োজন করে সকলেরই ধন্যবাদার্হ হলেন। তাদের কর্তব্যের একটা দিক এর ভিতর পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, জীবনের অন্যান্য কর্ম পথে—সৃজনী প্রতিভাই স্রষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখে। তাঁদের দৈহিক মৃত্যু হলেও নিজেদের সৃষ্টির মাঝে তাঁরা বেঁচে থাকেন। তাদের দৈহিক মৃত্যুতেও সভাসমিতি করে স্মৃতি তর্পণের নানান ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু মঞ্চ ও চিত্র জগতের যে সব বন্ধুরা নানান ভাবে আনন্দ পরিবেশন করে আমাদের মন ভুলিয়ে রাখেন—যাদের সৃজনী প্রতিভায় দেশের একটা বড় শিল্পের আজ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে—দুঃখ কষ্টের জীবনে তাদের দান কোন মতেই অবহেলার নয়। অথচ ক'জনের নাম আমরা মনে করে রাখি বা আমাদের পরবর্তী কালের জন্য তাদের বড় করে তুলে ধরি? এদের মৃত্যুর পর এমন কোন কিছুই আমরা করি না যাতে তাদের গুণগ্রাহী বন্ধুরা সমবেত ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন। অজয় বেঁচে থাকবেন গীতি কবি বলে। বাংলা সাহিত্যে তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু চিত্রপরি-চালকরূপে তার পরমায়ু কতদিন?—কতদিনই বা আমরা তাঁর কথা মনে রাখবো—? এই মনে রাখবার জন্য—চিত্রপরিচালকের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি—এই উপস্থিত হবার সুযোগ দিয়েছেন ডি, লিউক্স পিকচার্স। তাই তাদের আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

শ্রীযুক্ত ভদ্র যেন আমাদের মনের কথাগুলো কেড়ে নিয়ে বল্লেন তাই অন্ততঃ মনে মনে তাকেও নিজের তরফ থেকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না।

ডি, লিউক্স পিকচার্সের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন—।

"আজ যে ছবি দেখতে আপনারা উপস্থিত হ'য়েছেন" ভাষাচার্য মাইক্রোফোনের সামনে এসে দাড়ালেন। তার জড়িত কণ্ঠ—মৃতের ব্যাথায় কতখানি ব্যথিত সেই কথাই যেন বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। "সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে ছবির সূত্রধর আজ অনুপস্থিত, তাকে চিরদিনের জন্য আমরা হারিয়েছি। সূত্রধর—যিনি নিজের শক্তি দিয়ে যে কোন শিল্পের প্রাণ দান করতে পারেন। অজয় তিনিই ছিলেন এই ছবির সূত্রধর। মূলতঃ ছবির স্রষ্টা তিনিই। আমি বাইরে ছিলুম, যেখানে ছিলুম সেখানে কোন খবরের কাগজ সময় মত পাওয়া বা পৌছানোও সম্ভবপর নয়। এখানে যখন এলাম, শুনলুম—আমার ছাত্র—আমার বন্ধু—অজয় ভট্টাচার্য মারা গেছেন। ছাত্রাবস্থায় অজয়ের সংগে আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচয়ের সুযোগ হয়নি কারণ তিনি ছিলেন আত্মমুখি। ক্লাসে একদল ছেলে থাকেন যারা নিজেদের জাহির করবার জন্য উন্মুখ—আর একদল থাকেন যারা নিজেদের সব সময় আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখেন। এই আবরণের মাঝেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। অজয় ছিলেন শেষোক্ত দলের। ছাত্র হিসাবে তাকে খুব নিকটে না পেলেও বন্ধুরূপে তাকে আমি পেয়েছিলাম। তার ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা আমায় নানাদিক দিয়ে আকৃষ্ট করেছিল। যখন তিনি পরীক্ষক ছিলেন—

আমি তার উপরওয়ালা—উপরওয়ালার হৃদয় অতি সহজেই তিনি জয় করতে পেরেছিলেন। আমি একবার কথা প্রসংগে বলেছিলুম—দেখুন, আমরা ভাষাবিদ—আপনারা ভাষা স্রষ্টা—আপনারা আমাদের পথ প্রদর্শক। আপনাদের সৃষ্টিনিয়ে আমাদের কারবার। আপনাদের প্রতিভা আমাদের চেয়ে শতগুণে বেশী। একথা তিনি স্বীকার না করলেও আমি সম্পূর্ণরূপে মানি।" তারপর ভাষাচার্য অজয় ভট্টাচার্যের কবিপ্রতিভার কথা উল্লেখ করে বলেন, "বাঙ্গালীর গলায় তিনি গান ফুটিয়ে গেছেন। তাঁর কবিতা—তাঁর গান যেন নতুন সুরে—নতুন কথা নিয়ে বাঙ্গালীকে মাতিয়ে তুলেছিল। একবার আমার মনে পড়ে, বাড়ীতে মেয়েরা রেকর্ড বাজিয়ে শুনছিলেন গানের কথাগুলি যেন কেমন লাগলো, আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম—কার লেখা? দেখলাম অজয় ভট্টাচার্যের। পর পর তার লেখা গান অনেক শুনেছি—অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম গীতিকার আমারই একজন প্রাক্তন ছাত্র। মনে মনে গর্ব অনুভব না করে থাকতে পারিনি। বাংলাদেশে গানের অভাব নেই সত্য, কিন্তু অজয়ের বৈশিষ্ট্য অনেককেই ছাপিয়ে ওঠে। নজরুলের অনুপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। গীতি কবি রূপে নজরুল ছাড়া কেউ তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। দুঃখ কষ্টে জর্জরিত বাঙ্গালীর ম্লান মুখে তিনি হাসি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তার গানের ভিতর দিয়ে—এখানেইত একজন গীতিকারের সত্যিকারের জয়।"

চলচ্চিত্রের ভিতর জাতীয় উন্নতির সম্ভাব্যের কথা উল্লেখ করতে যেয়ে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চলচ্চিত্রের দৌলতে সর্ব ভারতীয় ঐক্যের যে বীজ অঙ্কুরীত হ'য়ে উঠছে তার সম্ভাব্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। পূর্বে এদায়িত্ব ছিল মঞ্চের। মঞ্চের ভিতর এই ঐক্যের বীজ নিহিত আছে—এখন চলচ্চিত্র এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এর পরিধি যেমনি প্রসার গতি তেমনি দ্রুত। রেডিও এ কাজে তাকে সহায়তা করছে—জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে একাজ আরো জয়যুক্ত সাধিত হবে। আমি নাসিক, বম্বে—ভারতের যেখানের যাই না কেন সেখান থেকে বাংলার গীতের সুর শুনছি—অখণ্ড ভারত আন্দোলনের এরা মহা অস্ত্র। ছবি আমি বেশী দেখিনি—আপনাদের অনেকের চেয়েই হয়ত অনেক কম দেখেছি কিন্তু যে কথানাই দেখে থাকি না কেন, একটুকু জোর করে বলতে পারি ভারতের কৃষ্টি কলাকে বাঁচিয়ে রাখতে—এর প্রসারের জন্য চলচ্চিত্রের শক্তি রয়েছে অসম্ভব।"

নাটক এবং চিত্রের তুলনামূলক আলোচনা প্রসংগে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন "নাটক এবং চিত্র উভয়ের কর্তব্যই এক—তবে নাটক থাকবে কোঠারীর মত। তার ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ। সিনেমা এযুগের তার পরিধি সীমাহীন।"

ডি, লিউক্স পিকচার্সের কর্তৃপক্ষদের এই স্মৃতিসভার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ইতিপূর্বে বন্ধুবর বীরেন ভদ্র যে কথা বল্লেন যে চিত্র বা মঞ্চ জগতের লোকদের মৃত্যুর সংগে সংগে সমস্ত চিহ্ন শেষ হয়ে যায়। জীবিত থাকতে যারা আমাদের রূপান্তরিবেশন করে বাঁচিয়ে রাখেন—মৃত্যুর পর তাদের বাঁচিয়ে রাখতে বোধেই আমরা ভূকপাত করি না—একথা নানা দিক দিয়ে প্রণিধান যোগ্য। তাই আমার মনে হয় এ বিষয়ে তাদের সর্বপ্রথমে অগ্রসর হওয়া উচিৎ—চিত্র ব্যবসায়ে যারা লাভবান হয়ে থাকেন। তাদের এরূপ করা উচিত—যেসব প্রতিভাবান শিল্পী চিত্র জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তাদের মৃত্যুর পর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর এই মহলের শিল্পীদের গুণাগুণ বিচার করে পারিতোষিকের ব্যবস্থা করা।

[আমরা যতদূর খবর নিয়ে জানি ডি, লিউক্স পিকচার্সের কর্তৃপক্ষ ১৯৪৩ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালককে অজয়-স্মৃতি পদক পুরস্কার দেবেন বলে স্থির করেছেন। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি রূপ-মঞ্চ পত্রিকার পৃষ্টপোষক শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ সেন ও কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং এর বন্ধুবর ফটিকচন্দ্র দত্ত যথাক্রমে ১৯৪৩ সনের শ্রেষ্ঠ—পরিচালক ও অভিনেতাকে অজয়-স্মৃতি পদক ও দুর্গাদাস স্মৃতি-পদক দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির পক্ষ থেকে ওরূপ পদক দেবার কথা উত্থাপিত হলে এঁরা দুজনেই তার ব্যয়ভার গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন।]

পরবর্তী কর্মীদের সামনে এদের তুলে ধরাই এই স্মৃতি-পদকের মূল উদ্দেশ্য। তাই কর্তৃপক্ষরা যদি এরকম করেন যেমন ধরুণ প্রতি বৎসর উপযুক্ততার বিচারে যে শিল্পী সকলের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন মৃত-শিল্পীর স্মৃতিপদক তাকেই দেওয়া হবে। এতে এদের স্মৃতি ঐ পারিতোষিকের সংগে জড়িত হয়ে থাকবে। আর বেশী কিছু আমি বলবো না। অজয়ের বাল্যবন্ধু ও সহকর্মী সুরশিল্পী শচীন দেববর্মন এবার অজয়ের শেষ লেখা একটী সংগীত আপনাদের শোনাবেন।"

শচীনদেব যেয়ে মাইক্রোফোনের সামনে বসলেন। পাশে অজয়ের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে সাজানো রয়েছে। একবার তাকালেন। কত সময়—কত আসরে—কবি বন্ধুকে পার্শ্বে নিয়ে শিল্পী রাগিনী ধরেছেন—তার সুর তরঙ্গ উপস্থিত শ্রোতাদের মণিকোঠায় যেয়ে ঢেউ দিয়ে এসেছে। তারপর চলেছে কবি পরিচিতি, 'যে প্রশংসা আপনারা আমায় করছেন তা আমার পাবার নয়—প্রাপ্য এর।" পার্শ্বে কবিকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই আজ দেখে নিলেন। নির্মম মৃত্যু অতর্কিতে পাশ থেকে বন্ধুকে যে সরিয়ে নিয়েছে হয়ত কয়েক মিনিটের জন্য একথা ভুলে ছিলেন শিল্পী। কিন্তু মৃত্যুর শক্তি কতটুকু যে শিল্পীর কাছ থেকে কবিকে ছিনিয়ে নেবে—তাইত বন্ধুকে চুপটী করে থাকতে দেখে শিল্পী রাগিনী বললেন—'কথা কও দাও সাড়া' সারা প্রেক্ষাগৃহে যেন গুমরে গুমরে উঠলো।—এই আকুল আর্তনাদে কে সাড়া না দিয়ে পারে—ছবির ভিতর থেকেই যেন কবিবন্ধু সাড়া দিয়ে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বেঁচে থাকবো তোমার গলায়—আমার কাব্যে—আমার ছবির পর্দায়—তোমার মত বন্ধুদের হৃদয়ে। মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শ সেখানে পৌছুতে পারবে না।'

শিল্পী থামলেন—তার জবাব পেয়েছেন বলে।

চলিত প্রথানুযায়ী অরোরা ফিল্মের শ্রীযুক্ত চিত্ত ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ জানালেন। রূপালী পর্দায় রূপকারের-রূপ নিয়ে ছদ্মবেশী আত্মপ্রকাশ করলো।

PHOTO D. RATAN & CO. ডি, রতন এণ্ড কোং ফটো
22-1, CORNWALLIS ST. CALCUTTA

অজয়ের জীবন কথা

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ অজয়বাবুর জন্মস্থান ত্রিপুরারই অধিবাসী। সাময়িক পত্রিকাগুলিতে গল্প, প্রবন্ধ লিখে থাকেন—কিছুদিন পূর্বে এর একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হ'য়েছে। বর্তমানে রূপ-মঞ্চ পত্রিকার সংগে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন। অজয়বাবুর পরবর্তী চিত্রে সহকারীরূপে শ্রীযুক্ত সিংহের কাজ করবার কথা ছিল। বন্ধুভাবে তিনি অজয় বাবুর সংগে মিশেছেন। অজয় বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব্বাশা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সংগেও এর ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। অজয় বাবুর জীবনী সম্পর্কে এজন্য তাকেই লিখতে অনুরোধ করা হয়। অবশ্য এবিষয়ে পূর্ব্বাশার প্রকাশক বন্ধুবর সত্যপ্রসন্ন দত্ত যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। শ্রীযুক্ত সিংহ অজয় বাবুর জীবনী লিখতে যেয়ে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের কথা যথাসম্ভব এড়িয়ে যেয়ে অজয় বাবুর দুর্দমনীয় চলার গতিকেই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন।]

এখন থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে। ১৯০৬ সালের জুলাই মাস। শহরের কোলাহল থেকে দূরে ত্রিপুরার সুদূর এক কোনে জংগল-ঘেরা একখানি বাড়িতে কবি অজয় ভট্টাচার্য জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের নাম শ্যামগ্রাম। তখনকার দিনে এই সব গণ্ডগ্রামে শহুরে বাতাস বড় একটা পৌছোয়নি। কিন্তু অজয়কুমারের পিতা রাজকুমার ভট্টাচার্য কুমিল্লায় উকিল ছিলেন বলে শহর-সভ্যতার কিঞ্চিত স্পর্শ পেয়েছিলেন। এই শহর-সভ্যতার আওতায়ই অজয়কুমার পরবর্তীকালে পরিবর্ধিত হয়েছিলেন।

অজয় বাবুর পিতা স্বর্গীয় রাজকুমার ভট্টাচার্য

ভট্টাচার্য-পরিবারের ইতিহাস বিরাট কিছু নয়। কিন্তু অকিঞ্চিৎকর এই ইতিহাসের বড় এক অশুভ মুহূর্তে অজয়কুমার জন্মেছিলেন। অজয়কুমারের মাতা শশীমুখী দেবী কিছুদিন পূর্বে তাঁর প্রথম পুত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান ছিলেন। তদুপরি শশীমুখীর পিতৃকুলের অনেক লোক সেই সময় ডাকাতি করে মারা যায়। দুইদিক থেকে এই ক্রমাগত শোকের চাপে অজয়কুমারের মাতা আকুল হ'য়ে পড়েছিলেন। পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের মৃত্যু দিয়ে তৈরী এই বিপর্যয়কে মাথায় করেই অজয়ের জন্ম। কুসংস্কার-[illegible] বাঙালী ব্রাহ্মণ-পরিবারে এই ছেলে যে [illegible] হবে সেটা অবধারিত। মাতা এবং সমগ্র পরিবারের কাছ থেকে অনাদর আর অবহেলা ছাড়া শৈশবে অজয়কুমার আর কিছু পাননি। শৈশবের দুঃখময় এই স্মৃতিটুকু তাঁর নিজের জীবনতৈরীর কাজে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলো। অনাদর ও অবহেলা-পরিপুষ্ট মনে ভগ্ন আশা নিয়ে যে জীবনের শুরু, সে জীবন স্বাধীন-চিন্ততায়ই গড়ে ওঠে। অজয়কুমারও আশৈশব স্বাধীনচিত্ত এবং এই স্বাধীনচিত্ততা ও মানসিক

দৃঢ়তাই পরবর্তীকালে তাঁর মায়ের অফুরন্ত স্নেহ আকর্ষন করতে সমর্থ হয়েছিলো।

পিতার কর্মস্থল কুমিল্লায় অজয়কে অতি শৈশবেই চলে আসতে হয়। সেদিনের কুমিল্লা, আজকের কুমিল্লা নয়। বিশ শতকের প্রথম দশকের কুমিল্লার উপর তখনো উনিশ শতকীয় গেঁয়ো ছাপ। চারিদিকে ঝোপ-ঝাড়, বড় বড় বুনো গাছের আঁড়ালে ছোট ছোট বাড়ি, কেরোসিনের টিনে ছাওয়া, আলোহীন কাঁচা মেঠো রাস্তায় মুখ লুকিয়ে মানুষ চলতো রাত বিরেতে, নালায়-নালায় মশার আড়ৎ আর তারই মধ্যে ঠুং-ঠাং করে ছুটে চলেছে খানকতক ঘোড়ার গাড়ি। তবু এরই নাম শহর। আর আজ? অজয়ের জন্মের সাঁইত্রিশ বছর পরে? ধনতন্ত্রের

কন্যা রুমুকে নিয়ে স্ত্রী রেণুকা দেবী

হীরের কাঠির স্পর্শে জেগে উঠেছে সেদিনের ঘুমন্ত পুরী। ব্যাংক-ইন্সুরেন্স, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা-সংগীতে, কুমিল্লার স্থান আজ বাঙলা দেশের সংস্কৃতির পুরোভাগে। ত্রিপুরার এই নব জাগরণের সূত্রপাত বিশ শতকের প্রথম দিকে।

অজয়ের শৈশবকালীন কুমিল্লায় কোন ভালো স্কুল ছিলো না। ঠিক এই সময়ই দেশখ্যাত দানবীর শ্রীযুত মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিঃসন্তানা স্ত্রী তাঁর নিজ গৃহে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সন্তানহীনা সহধর্মিনীর এই আকাঙ্খাকেই মহেশচন্দ্র পরবর্তী কালে কুমিল্লার শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত করেন।

মহেশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বর পাঠশালাতেই একদিন নিতান্ত একা অজয় তাঁর বর্ণপরিচয় নিয়ে প্রবেশ করে-ছিলেন। রোগাটে জীর্ণ দেহ, কিন্তু চোখ দুটি বিস্ফারিত। অজয় ঈশ্বর পাঠশালার প্রথম ছাত্রদের একজন। স্কুল জীবনে অজয়ের শিক্ষার ভার যারা নিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে অজয়ের ভবিষ্যত প্রতিভা সেইদিনই ধরা পড়েছিলো। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বর পাঠশালায় কোন পরীক্ষায় অজয় প্রথম স্থান ছাড়া অধিকার করেননি। কোন বিপর্যয়ই তাঁকে বাধা দিতে পারেনি। একবারের কথা বলা যায়। তখন অজয় পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকী। হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলো অজয়। তাঁর পরীক্ষা বিষয়ে সকলেই সন্দিহান হয়ে উঠলো। কিন্তু শীর্ণ-দেহ অজয় সকল সন্দেহ ও দুশ্চিন্তাকে নিবসন করে সে বছরও পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তির এমনি প্রখরতাই অজয়ের শিক্ষকগণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিলো।

ঈশ্বর পাঠশালার তখনকার দিনে যে সব শিক্ষক বিদ্যালয়টিকে বাঙলাদেশের চোখে বড় করে তুলতে চেষ্টা

করছিলেন, বাংলার শিক্ষক শ্রীযুত অবনী চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। তিনি আজও জীবিত। উদারনীতিক মত পোষন করতেন বলে ছাত্র সমাজ তাঁর সাহিত্যিক আদর্শের কাছে মাথা নত করতো। অজয়কুমারের জীবনে নীরবকর্মী এই স্কুল শিক্ষকের প্রভাব কত ব্যাপক, তা অজয়ের নিজের কাছে অনেক শোনা গেছে। আর একটি লোক, যার কাছে অজয়কুমারের প্রতিভা সমান ভাবে ঋণী—তাঁর নাম শ্রীযুত বীরেন সেন। এই বীরেন সেনের বাড়িতেই অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে কবি নজরুল ইসলাম কিছুদিন পরে গমন করেন এবং বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। এই দুইজনের কাছ থেকে প্রগতির প্রথম আলো পেয়ে একদা অজয় স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে আসবার আগেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত নিজের দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সমাজের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এমনি করেই অজয় নিজের পথ তৈরী করে আসছিলেন। এই প্রগতির পথে পিতার উদারনীতিও যে কথঞ্চিত সহায়তা করেছিলো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপবীতত্যাগের জন্যে শশীমুখী পুত্রকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সুযোগে বীরেন সেনের গৃহে নজরুল যে আসরটি জমিয়ে তুলেছিলেন, সেই সংগীত-মুখর প্রগতি-কেন্দ্রে অজয়কুমারও ক্রমে একজন সভ্য হয়ে উঠলেন। নজরুলের সংস্পর্শে এসে নজরুলের কাব্য ও সংগীতের ভাবৈশ্বর্যে উদ্বোধিত হয়ে উঠতে অজয় কুমারের বেশীদিন লাগেনি এবং লাগেনি বলেই নজরুলী ছাঁদে কবিতা রচনা করতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই পেরেছিলেন। নজরুলের ধূমকেতু পত্রিকাতেই অজয়ের প্রথম কবিতা 'উল্কা' প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই অজয়-কাব্যের ক্রমবিকাশ শুরু। সংগীত ও সাহিত্যের আসর ছাড়া খেলাধুলা ও নাটকের হৈ-হুল্লড়েও অজয়-কুমার ইতিমধ্যেই মেতে উঠেছিলেন। বাইরের এত

পুত্র অঞ্জন ও কন্যা রুমা। সংগে তাদের খেলার সাথীটিও

আকর্ষণের বেড়ি ছাড়িয়েও ১৯২৩ সালে অজয়কুমার যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পেয়ে পাশ করলেন, তখন কুমিল্লাবাসী সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলো। ক্ষীন-দেহী এই যুবক একদিন সারা দেশের চোখে দুলাল হয়ে উঠবে, একথা অনেকের মনেই সেদিন গুমড়ে উঠেছিলো। কারণ, (খেলা-ধূলা, আবৃত্তি-অভিনয়, সাহিত্য-সংগীত ও বুদ্ধিপ্রাখর্যে ইতিমধ্যেই অজয়কুমার কুমিল্লার রাস্তা-ঘাটে ও গৃহাভ্যন্তরে আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠেছিলেন।)

১৯২৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে অজয়কুমার কলিকাতায় আসেন এবং বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তী হন। তখন তাঁর বড় ভাই বিজয়কুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দুই ভাই ক্যানিং-হোষ্টেলে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই অজয়কুমার হোষ্টেলের নিরেট

জীবনে প্রচুর জীবন-প্রবাহের সূচনা করেন। মহানগরীর শত-আস্ফালনের মধ্যেও তিনি তাঁর কুমিল্লার জীবনকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং আনতে সমর্থও হয়েছিলেন। তিনি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র তখন তিনি ক্যানিং হোষ্টেলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পূর্ণজন্ম মঞ্চস্থ করেন। ইতিপূর্বে ক্যানিং হোষ্টেলে এতো সুন্দরভাবে কোন নাটক অভিনীত হয়নি। অজয়কুমার পরিচালনা ছাড়া নিজে যাদব চক্রবর্তীর ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রোতৃবর্গকে চমকিত করেছিলেন। পুরাতন নাটুকে ঢং ও ব্যঞ্জনাকে তিনি তখন থেকেই ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন এবং দানী বাবুর পদ্ধতিকে অনুসরণ না করে তিনি নরেশ মিত্র ও অহীন্দ্র চৌধুরীর নূতন ধারাকে গ্রহণ করেন। তখন শিশিরকুমারের যুগ প্রচণ্ডভাবে চলেছে। কলিকাতার নাটুকে মহলে ও সংগীতের জলসায় তিনি অবধারিত ভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন এবং তাঁর এই নাটুকে নেশাকে তাঁর অভিভাবকবৃন্দ ভীতির চোখেই দেখতে শুরু করেছিলেন। কারণ, সাহিত্যের ও সংগীতের সংগে নাটুকে নেশা এসে যোগ দিয়েছিলো বলে, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। সকল সন্দেহ সত্ত্বেও অজয়কুমার ১৯২৫ সালে প্রথম বিভাগে আই এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও বাংলায় ৮০ নম্বরের অধিক পেয়ে 'লেটার' পান।

আই-এস-সি পরীক্ষায় আরো ভালো ফল হলো না, এক রকম এই অপরাধেই অজয়কে কুমিল্লায় ফিরে যেতে হয়েছিলো। কুমিল্লা কলেজেই তিনি বি, এ পড়তে আরম্ভ করেন এবং কলিকাতার দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাকে কুমিল্লার আবহাওয়াতে নানা কাজে নিয়োজিত করতে লাগলেন। অজয়কুমারের কলেজ-জীবনের প্রথম অভিনয় ওথেলোর (othelo) ইয়াগো চরিত্রের রূপায়নে। অজয়কুমারের প্রিয়বন্ধু রস-সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তী ওথেলো অনুবাদ করেছিলেন। অজয় যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র তখন তিনি কুমিল্লায় সরলা নাটকে গদাধরের ভূমিকায় অবতরণ করে সুযশ অর্জন করেছিলেন।

কুমিল্লায় এই নাটকের বাজার উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের আর কোন মফঃস্বল শহরেই সেদিন এ জিনিষ সম্ভব হয়নি। চাঁদপুরের বিখ্যাত যাত্রাগান প্রবর্তক উমানাথ ঘোষাল থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় ঢপ-গানের দল ত্রিপুরার শহর ও গ্রামাঞ্চলকে মুখরিত করে রেখেছিল। তদুপরি শিক্ষিত সমাজ পরিচালিত থিয়েটার কুমিল্লার পৌর-জীবনের উপরও কম প্রভাব বিস্তার করেনি। গ্রেট ভাণেল থিয়েটার এক সময় কুমিল্লার বিশিষ্ট একটি সৌখীন দল ছিলো। অজয়কুমারের পিতা রাজকুমার ভট্টাচার্যও এই নাট্যগোষ্ঠির একজন অভিনেতা ছিলেন। পিতার নাট্য-প্রীতি যে পুত্রদের উপর প্রভাব বিস্তার করেনি, এমন নয়। পুত্র অজয় কিন্তু প্রাচীন যাত্রা-চণ্ডী থিয়েটারের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই নিজের মত ও গোষ্ঠি তৈরী করছিলেন এবং সত্যিই একদিন কুমিল্লার অনিল দাস, সতু চৌধুরী প্রভৃতি নাট্যামোদী বন্ধুদের নিয়ে নব-প্রেরণায় নূতন নাট্য-সম্প্রদায় সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। এই নূতন সৌখীন নাটুকে দলে অজয়ের বড় ভাই বিজয়কুমারও এসে হাত মিলিয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত সঞ্জয় ভট্টাচার্য অজয়কুমারের ছোট ভাই। ছোট ভাইও দাদার এই সৃষ্টির কাজে ইতিমধ্যেই হাত পাকাতে শুরু করে দিয়েছিলো। কুমিল্লা কলেজের প্রগতিপন্থী পারিপার্শ্বিকে স্থানীয় যুবক সম্প্রদায় নূতন সংস্কৃতির স্পর্শে এমনই এক ব্যাপক কাজে হাত দিয়েছিলো যে শহরের বর্ষীয়ান ভদ্রলোকগণ একদা এদের ভীতির সংগে বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন।

এমনি এক জাগরণের দিনে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও রংগমঞ্চ অভিনেতা কৃষ্ণচন্দ্র দে (কাণা কেষ্টো) কুমিল্লায় গেলেন। এর কিছুদিন পূর্বে বর্তমানে সুপরিচিত পরিচালক সতু সেন কুমিল্লায় 'মেবার পতন' মঞ্চস্থ করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে 'সীতা' অভিনয়ের আয়োজন করলেন। সীতা নাটকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র দে বৈতালিক, অজয় অশ্বরক্ষক ও সঞ্জয় লবের ভূমিকায় অবতরণ করে সারা শহরে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার করেছিলেন। বিখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদার, সংগীতজ্ঞ হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর) প্রভৃতি বন্ধুগণও কুমিল্লার এই আনন্দমেলার সৈনিক ছিলেন। কিন্তু হলে কি হয়, অজয়ের তখন বি, এ পরীক্ষা এসে গেছে। জ্ঞানলাভে সদা-সন্ধিৎসু অজয়কুমার পড়াশুনাকে খতম করে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দেননি এবং যথাসময়ে ১৯২৭ সালে তিনি সসম্মানে বি, এ পাশ করেন। কুমিল্লা কলেজের অধ্যক্ষ সতেন্দ্রনাথ বসু অজয়কে তার সর্বতোমুখী প্রাখর্যের জন্য পুত্রাধিক স্নেহ করতেন এবং পরবর্তী জীবনে অনেক চিঠিপত্রে তিনি অজয়কুমারকে জানিয়েছেন যে তাঁর মতো ছাত্র পেয়ে তিনি নিজে গৌরবান্বিত। অজয়ের এই জ্ঞানসন্ধিৎসা মৃত্যু অবধি দেখা গেছে। সেই সময় হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের বাড়িতে একটি সংগীতের আসর বেশ জমে উঠেছিলো। শান্তিনিকেতনের শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় ও সেই সময় কুমিল্লায় কিছুদিন ছিলেন। এমনিতর আসরগুলিতে কিংবা অন্যান্য যে কোন অনুষ্ঠানে তদানীন্তন কুমিল্লায় অজয়কুমার ছিলেন মূল প্রাণশক্তি। সুপরিচিত সুরশিল্পী জ্ঞান দত্ত ও এই সময় এসে কুমিল্লার এই আনন্দমেলায় যোগ দেন। অজয়কুমারের বন্ধুসম্মিলন অদ্ভুত। এই বন্ধু গোষ্ঠি-পরিবৃত হয়েই অজয় ধীরে ধীরে বাংলার শ্রেষ্ঠ সংগীতকার হয়ে উঠছিলেন। কুমিল্লার যে আবহাওয়া ও পরিবেশে তিনি পরিবর্ধিত হয়েছিলেন, সেই পরিবেশকে অজয়কুমার মৃত্যু পর্যন্ত গৌরবের সংগে স্মরণ করতেন।

বি, এ পাশ করার পর তিনি আবার কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং এইবার এসে অজয়কুমার তার শিল্পী বন্ধু অনিল ভট্টাচার্যের সংগে তখনকার প্রগতিশীল পত্রিকা 'কল্লোলে' যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন। বাংলা-সাহিত্যে অনুরাগ তাঁর জ্ঞান অবধি, কিন্তু এ যাত্রা কলিকাতা এসে তাঁর সেই অনুরাগ যেনো দ্বিগুণিত হলো। অজয়কুমার বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পড়তে সুরু করলেন।

এম এ পড়ার সংগে সংগে কবিতা রচনা এগিয়ে চললো

পুত্র অঞ্জন হাতে খড়ির সময়

শ্রীমতী বিজয়া দাশ বি, এ তারকায়িত

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়
বাণী চিত্রে—
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের

শেষ রক্ষা

বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ছবির পর্দায় যাঁদের
দেখতে আপনি ভালবাসেন।
—ঃ সঙ্গীত পরিচালনা ঃ—
অনাদি দস্তিদার (কণ্ঠ) ঃ দক্ষিণা ঠাকুর (আবহ)

চিত্রশিল্পী—
বিভূতি লাহা

শব্দযন্ত্রী—
যতীন দত্ত

চিত্রভারতীর নিবেদন

এ বি প্রডাকসন্সের
সঙ্গীতমুখর
মোহন চিত্র
নীদান
শ্রেষ্ঠাংশে—
নূরজাহান
মাসুদ

প্রদীপ পিকচার্সের
সঙ্গীতমুখর
কৌতুকচিত্র
উকিল সাহেব
শ্রেষ্ঠাংশে—
মাধুরী
ত্রিলোক কাপুর

মুক্তি প্রতীক্ষায়

পরিবেষক—কোয়ালিটি ফিলম্‌স্ কলিকাতা

সমান বেগে। সংগীত, সাহিত্য, জলসা, নাটক, খেলাধূলা—সব কিছুতেই অজয়কুমার জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। এটা দেখা গেছে যে, যে প্রতিষ্ঠানে একবার তিনি প্রবেশ করেছেন সে প্রতিষ্ঠানকে নিজের বলে ভাবতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই পরাত্ম-বোধ তাঁর এতো বেড়ে উঠেছিলো যে বন্ধুগণ তাঁর এম, এ পরীক্ষা সম্পর্কে সন্দেহের সংগে জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন। কিন্তু অন্যান্যবারের মতো এবারও অজয়কুমার সকলকে বিস্মিত করলেন। মাত্র তিন মাস পড়াশুনা করে ১৯২৯ সালে তিনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন।

কবি অজয় ভট্টাচার্যের জীবন শুরু হয়েছে [illegible] গণ্ডী থেকে, কিন্তু গীতিকার অজয়ের যাত্রা এবার থেকে শুরু। অজয়ের সংগীত রচনার আরম্ভটাও শোনবার মতো। তার এক সাহিত্যিক বন্ধু তখন ভালো ভালো গান লিখছিলেন। একদিন এক চায়ের মজলিসে সেই বন্ধুটি অজয়কে বলেন—কবিতা লেখা অনেক সোজা। গান লেখো দেখি। গান লেখা কঠিন ব্যাপার। অজয়ের দৃঢ়-চিত্তে সেদিন এই কথাটি বড় লেগেছিলো এবং সহাস্যে তিনি বলেছিলেন—ছোঃ, গান? ঘণ্টায় পাঁচটা লিখতে পারি—জানিস? সত্যিই সেদিন বিকেলে তিনি কয়েক-খানা গান লিখে নিয়ে এসেছিলেন। এমনি করেই কবি অজয় গীতিকার হবার পথে পা বাড়িয়েছিলেন। (অজয়-কুমারের প্রথম গীতি রচনা—'হাসনুহানা আজ নিরালা, ফুটলি কেন আপন মনে।' শোনা যায়, এই প্রথম সংগীতটীর সুর সংযোজনা করেছিলেন সুরসাগর হিমাংশু দত্ত এবং সুরশিল্পী জ্ঞান দত্ত নিজ কণ্ঠে গেয়ে গেয়ে প্রচার করেছিলেন।) অজয়ের প্রথম রেকর্ড-সংগীত—'ও পিয়ারী লায়লা আমার' ও 'মজনু আমায় দাওগো বিদায়'—এই রেকর্ড-সংগীতের সংস্পর্শে এসেই তিনি বাংলা দেশের বড় বড় গ্রামোফোন কোম্পানীগুলির সংগে পরিচিত হন। এম, এ পাশ করার পর অজয়কুমার কুমিল্লায় ফিরে আসেন। [illegible] বাংলার চট্টগ্রাম [illegible]-পুষ্ঠদেশ [illegible]—[illegible] চট্টগ্রাম বিভাগে ধর-পাকর হৈ-হল্লোড়। [illegible] রাজশক্তির দারুণ দাপট। [illegible] বৃত্ত [illegible] অজয় কুমার [illegible] দেবীকে বিবাহ করেন। রেণুকা দেবীর পিতৃগৃহ [illegible] অন্তর্গত মেড্ডা গ্রামে। [illegible] গার্হস্থ্যজীবনের বড় উষ্ণ পরিবেষ্টনের মধ্যেই অজয়কুমার বিবাহিত জীবনে পদার্পন করলেন। এই সময়ই তিনি বিখ্যাত Road Back গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

[illegible] জীবনে অজয়কুমার বিবিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। ছাত্র জীবনের [illegible] তখন চলে গেছে। [illegible] জীবনের [illegible] তাঁর বিবাহিত জীবনকে [illegible] করতে চেয়েছিলো। [illegible] কুমারদের জন্যে কুমিল্লায় কুমার বোর্ডিং [illegible] নিযুক্ত হন। একদিক দিয়ে এই গৃহশিক্ষকতা অজয়ের পরবর্তী জীবনে কাজে লেগেছিলো। এই সময় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লায় যান এবং শরত-বন্দনা উপলক্ষে বিরাট আয়োজন করা হয়। 'ষোড়শী' নাটকে অজয়কুমার নিজে জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন। অনেকে বলেছিলেন শিশিরকুমারের জীবানন্দের সংগে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারতো অজয়ের জীবানন্দ। কিছুদিন পরে তিনি নিজের বাল্য ও কিশোর জীবনের চারণ-ভূমি ঈশ্বর-পাঠশালায় অল্পদিনের জন্যে শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপক হবেন, এমন এক গুপ্ত আশা অজয়ের ছিলো। কিছুদিনের জন্যে তিনি কুমিল্লা কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের ক্ষীণবুদ্ধি ও অদূরদৃষ্টি অজয়কে পাকা-

উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী অবলম্বনে গ্রথিত—
—ঃ ভ্যারাইটি পিকচার্স এর ঃ—
সার্থকতম নিবেদন

পোষ্যপুত্র

হৃদয়ের অশ্রুধারায় অভিস্নাত নারী হৃদয়ের যে চিরন্তন বেদনা তাহার সর্বস্ব নিবেদনের মধ্যে সার্থক হইয়া উটিয়াছে—তাহারই প্রতিরূপ এই কথাচিত্রটিকে ভাস্কর করিয়া তুলিয়াছে। পিতার নির্মমতা—হৃদয়াবেগের উচ্ছসিত প্লাবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠীয়াছে—বাঙলার চিরস্মরণীয় এই অমর উপন্যাসটির মধ্যে। বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা—নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অভিনয়ে দীপ্ত।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সতীশ দাশগুপ্ত**

গীতকার : **প্রণব রায়** স্বরশিল্পী : **দুর্গা সেন**

ভূমিকায় : শৈলেন, রেণুকা, প্রভা, তুলসী, সন্তোষ, বেচু, বিমান প্রমোদ প্রভৃতি।

সগৌরবে মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে একযোগে চলিতেছে।

২-৩০টা, ৫-৩০টা ও ৮-৩০টা

অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন।

ভ্যারাইটি পিক্‌চার্সের—
বহু প্রশংসিত পৌরাণিক চিত্র

কর্ণার্জ্জুন

আবার আপনারা কলিকাতার
চিত্রগৃহে দেখিতে পাইবেন।
শ্রেষ্ঠাংশে : অহীন্দ্র, ছবি, জহর, রেণুকা, পদ্মা, চন্দ্রাবতী
পরিচালনা : জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
সতীশ দাশগুপ্ত

গঠন প্রতীক্ষায় !

ভ্যারাইটি পিকচার্সের
চাঞ্চল্যকর সমাজচিত্র

P. W. D.

পরিচালনা : ?

একমাত্র চিত্র পরিবেশক : ভ্যারাইটি ফিল্‌ম্‌স্ ৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

পাকি ভাবে নিযুক্ত করবার জন্যে এগিয়ে আসেনি। কলেজের দুর্ভাগ্য বটে!

নাটকের আসর আবার জমে উঠলো। অনেক নাটক অজয়ের পরিচালনা ও অভিনয়ের গু[illegible] [illegible]বলীল হয়ে উঠেছে। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অনেকের মুখে একথা শোনা যেতো। কুমিল্লার চৌমুহ[illegible]র ছোট এক চায়ের দোকানে নিত্য এসে [illegible] কাটায় কাটায় জমাট বাধতো অজয়ের বন্ধুগণ। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা হতো চায়ের কাপের উপর। এমনি এক উষ্ণ-মুহূর্তে একটি প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকার পরিকল্পনা অজয়, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুদের মনে দানা পাকিয়ে ওঠে। (কল্লোল পত্রিকার মৃত্যু হয়ে গেছে অনেকদিন আগে। কল্লোলের প্রগতিশীল উত্তরাধিকারকে মাথায় নিয়েই অজয় কুমিল্লায় 'পূর্বাশা' পত্রিকার সূচনা করেন।) বহু বড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে আজও 'পূর্বাশা' সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় [illegible] প্রকাশনায় তার সেদিনের উত্তরাধিকারকে বহন করে চলেছে। চায়ের দোকানের যে ক্ষীণ সম্ভাবনায় সেদিন পূর্বাশা বেরিয়েছিলো, আজ অজয়ের মৃত্যুর পরে সে সম্ভাবনা শত বিস্তারিত। শত নাটক সত্ত্বেও অজয়ের মনে শান্তি ছিলো না। শিক্ষিত ও বিবাহিত জীবনের [illegible] অজয়কে পাগল করে তুলছিলো। নানা দুশ্চিন্তা [illegible] এই সময় কিছুদিন দুর্দৈব 'মেলাংকোলিয়া' (melancholia) রোগে আক্রান্ত হন এবং একসময়ে অনিবার্য [illegible] মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে আসেন।

১৯৩৪ সালে কলিকাতা [illegible] আবার পাড়ি দিলেন অজয়কুমার। এ যাত্রা মহানগরী কবিকে সম্বর্ধনা জানালো, [illegible]কারকে বুকে টেনে নিলো [illegible]।

[illegible] অজয়কুমার গীতিরচনায় মনোনিবেশ করলেন প্রচণ্ডভাবে এবং এই [illegible] কবি শচীন্দ্রদেব বর্মণের সংগে পুনে[illegible] পরিচিতি ক্রমে নিকটতর হয়ে উঠলো। একদা এই দুটি শিল্পীমনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব বাংলা দেশের সংগীতলোকে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিলো, আজ বাঙালী রসিকজন একথা জানে। অজয়-সংগীত, শচীন-কর্তার কণ্ঠে গাওয়া—বাংলাদেশের রসলোকে একখানি বড় চমকানো ও মধুর। কিছুদিন পরে অজয়কুমার রাসবিহারী এভিন্যুর তীর্থপতী স্কুলে বাংলা ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৪০ সালে চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত [illegible] এই [illegible] শিক্ষকতা করেন। শোনা যায়, [illegible] শিক্ষক জীবনের স্কুলে আর আসেনি। কিন্তু শিক্ষকতায় অজয়ের মন হাঁপিয়ে উঠেছিলো। [illegible] শিক্ষকতাকে [illegible] করতে কোনদিনই চাননি। [illegible] যে [illegible] তিনি যেতে ছিলেন সেই অভিনয় নিয়ে [illegible] কিছু করবার জন্যে [illegible] শুধু [illegible] করতো। রংগমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের সংগীত [illegible] হিসেবে [illegible] তিনি দেশের কাজে [illegible] এবং [illegible] থেকে চলচ্চিত্রের বিচিত্র [illegible] তিনি আ[illegible] [illegible] লাগলেন। চলচ্চিত্রের [illegible] থেকে একদিন অকস্মাৎ ডাক আসতে পারে, এমনি এক আশা কবির [illegible] মনে [illegible] লোকচক্ষুর অন্তরালে [illegible] এমনি এক [illegible] জন্যে তিনি নিজেকে তৈরী করছিলেন। নিজের পারিবারিক জীবনে [illegible] তিনি [illegible] মাকে হারিয়েছিলেন ১৯৪০ সনে। স্ত্রী রেণুকা দেবী [illegible] সাহচর্যে এবং নিজের চেষ্টায় [illegible] ৪০ সনে আই-এ পরীক্ষায় পাশ করে কৃতী স্বামীর সহধর্মিণী হবার যোগ্যতা দেখিয়েছিলেন। ইদানীং তিনি বি, এ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন।

চলচ্চিত্রের [illegible] থেকে সত্যিই একদিন ডাক এলো

দেশ—২৯।১।৪৪

ছদ্মবেশীর সংগে অজয়বাবু অকাল মৃত্যুর করুণ স্মৃতি বিজড়িত আছে, একথা বাদ দিয়েও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে 'ছদ্মবেশী' একখানি প্রথম শ্রেণীর বাংলা চিত্র হ'য়েছে' স্বর্গত পরিচালক নিজের বুকের রক্ত দিয়ে বাঙ্গলা দর্শক সাধারণের জন্যে হাসির যে বিপুল আয়োজন করে গেছেন, তা বহুদিন পর্যন্ত তাদের আনন্দ বিধান করতে পারবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

"His Master's Voice"

ছায়াচিত্রের নূতনতম গানের রেকর্ড

"বন্দীর" গান (চিত্ররূপা লিমিটেড)

সঙ্গীত-পরিচালনা : গিরীন্ চক্রবর্ত্তী

N 27362 { চোখে চোখে রাখি (মেরাসি ও মেরাসিনের গান)
তুমি কি কি কি (শিব দুর্গার গান)

N 27363 { চোখে চোখে রাখি (মেরাসি ও মেরাসিনের গান)
গান যে শুনিবে প্রিয় (কল্যাণীর গান)

"সহধর্ম্মিণী"র গান (রূপশ্রী লিমিটেড)

সঙ্গীত-পরিচালনা : কমল দাশগুপ্ত

N 27364 { নিয়ে যাও শেষের গানখানি (চন্দ্রার গান)
মন যে আমার (চন্দ্রা ও ললিতার গান)

N 27365 { ফাগুনরাতে ওঠে যবে চাঁদ (চন্দ্রার গান)
হৃদয় কারে চাহে (চন্দ্রা ও নগেনের গান)

"আলেয়া"র গান (নিউ সেঞ্চুরী প্রডাক্সন্স)

সঙ্গীত-পরিচালনা : [illegible] গুপ্ত

N 27366 { ফাগুনবনে জ্বালি রূপের শিখা (মীনার গান)
আমার গানে তোমার হৃদয় (চিত্রা ও শেখরের গান)

N 27367 { জানি জানি হে বিরহী (চিত্রার গান)
স্বপ্নে আমায় কে পরা'ল মালা (মীনা, শেখর ও লক্ষ্মীর গান)

"যোগাযোগ" (এম্, পি, প্রডাক্সন্স) ও

"গরমিল"-এর (চিত্রবাণী লিমিটেড) গান

সঙ্গীত-পরিচালনা : কমল দাশগুপ্ত

N 27377 { তুমি দুঃখ দিতে ভালবাস (মাধবীর গান—"গরমিল")
ও গায়ে যাব না (ছাদপেটা গান—"যোগাযোগ")

"নীলাঙ্গুরীয়" বাণীচিত্রের গান

N 27401 { জানি না কখন
এই রাঙামাটীর দেশে

N 27402 { সাত ভাই চম্পা
দেখেছি নয়ন মেলে

হিজ্ মাষ্টারস্ ভয়েস্

দি গ্রামোফোন কোং লিমিটেড

দমদম বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লী

রঙ্গ-মঞ্চ

এবং যেদিন এলো সেদিন পশ্চাতের অফুরন্ত স্মৃতিকে পশ্চাতে ফেলে সৃষ্টির কাজে অজয়কুমার এগিয়ে এসেছিলেন দুর্দম শক্তি নিয়ে। নতিকারের প্রতিভা এবার আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেলো। মডার্ণ টকিজের 'অশোক' চিত্র পরিচালনার ভার পড়লো তাঁর উপর। প্রযোজনার দিক থেকে নানা বাধা সত্ত্বেও অজয়কুমার অশোককে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। অশোকের সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে ডি লুক্স পিকচার্স অজয়কে 'ছদ্মবেশী' পরিচালনার ভার দেন। ময়দানবের শক্তি নিয়ে অজয়কুমার ছদ্মবেশীর সৃষ্টি করেছিলেন—কিন্তু নির্মম মৃত্যু এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। তাঁর সৃষ্ট ছদ্মবেশীর মুক্তির অবকাশ পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ তাঁকে মৃত্যু দেয়নি। নিতান্ত সবল দেহেই অজয়কুমার সেদিন (২৪শে ডিসেম্বর, ৪৩) পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে রাসবিহারী এভিন্যু-রসা রোডের মোড়ে একটি চায়ের দোকানে অজয়কুমারকে নিত্য দেখা যেতো। হাসি-উচ্ছল অজয় তরুণ বন্ধুদের মধ্যে একটা দুরন্ত মূর্তিমান প্রাণশক্তির মতো বসে থাকতেন দিনের পর দিন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন—মদের দোকান থেকে ফরাসী-বিপ্লব হয়েছিলো, আমরা করবো চায়ের দোকান থেকে। [illegible] কোন পরপারে আজ অজয়কুমার আছেন, জানি না। তবে প্রতিদিন রেডিয়ো-গ্রামোফোন, রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র ও রাজপথের কলকণ্ঠে যখন অজয়-সংগীত বেজে ওঠে তখন মনে হয় অজয়কুমারের মৃত্যু হয়নি। বাঙালীর সংস্কৃতির রসলোকে অজয়কুমার নিজের স্থান নিজেই রেখে রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত ভাবে নিজে যা হারিয়েছি, যা না হারালে নিজের জীবনও অজয়ের মত গড়ে উঠবে ভেবেছিলাম, সে হারানোর দুঃখ ও অভাব জীবনে ভরে উঠবে না, একথা ভেবেই শুধু চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। অজয়ের বালক পুত্র অঞ্জন ও শিশুকন্যা [illegible] শোকের সংগে আমারও চোখের জল আজ এক হয়ে যায়।

অজয়ের রচিত গ্রন্থ

রাতের রূপকথা (কবিতা)
রোড ব্যাক (অনুবাদ)
মিলন-বিরহ-কথা (সংগীত)
যেথা নাহি প্রেম (উপন্যাস)
ঈগল ও অন্যান্য কবিতা
শুক-সারী (সংগীত)
আজি আমারি কথা (সংগীত)
সৈনিক ও অন্যান্য কবিতা।

অজয় ভট্টাচার্য লিখিত গীতি-গ্রন্থ 'শুকসারী' সম্পর্কে শ্রীশ্রীঅরবিন্দের অভিমত :

"The songs are very beautiful. Here is evident everywhere in them a delicate psychic inspiration and poetic gift."

SRI AURABINDA.

অজয় স্মরণে

—শ্রীকামিনীকুমার রায়—

[শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার রায় অজয় বাবুর সহপাঠী ছিলেন। অজয় বাবুর অন্তরের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। অজয় বাবুকে যে ভাবে তিনি দেখেছেন, সেই ভাবেই তার পরিচয় এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপ-মঞ্চের পাঠকপাঠিকার সংগে শ্রীযুক্ত রায়ের ইতিপূর্বেই পরিচয় হয়েছে। বর্তমানে তিনি সাহিত্য-পরিষদের সংগে সংশ্লিষ্ট]

বন্ধুবর অজয় ভট্টাচার্য আর নাই।

এই 'নাই' কথাটি যে আমাদের পক্ষে কতখানি মর্ম-পীড়াদায়ক তাহা আমরা যাহারা দীর্ঘ বৎসর তাহার সাহচর্যে কাটাইয়াছি তাহারাই বিশেষ করিয়া বুঝিতেছি। জানি মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত আর কিছু নাই, আবার তাহার আগমনের দিনক্ষণও যে আকস্মিক, অনিশ্চিত তাহাও আমাদের অজানা নয়। তবু অজয়ের মৃত্যু যে এত নিশ্চিতরূপে এত শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা তাহার হাস্যভরা মুখের সম্মুখে বসিয়া কোনদিন একটিবারও মনে হয় নাই। জানি, জীবনকে কেহ চিরকাল এক স্থানে ধরিয়া রাখিতে পারে না, লোকে লোকে তাহার নিমন্ত্রণ—

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচাল আলোকে আলোকে।"

তবু এই সুন্দর ভুবনে, ততোধিক সুন্দর অজয়ের—মানুষ অজয়ের জীবন-কাল যে এত শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে, লোকান্তর হইতে জীবনান্তরের নিষ্ঠুর নিমন্ত্রণ লিপি যে এত আকস্মিকভাবে তাহার হাতে আসিয়া পৌছিবে, তাহা তো কখনই মনে হয় নাই, সেও তো ভুলেও মনে করিতে পারে নাই। এই সেদিনও কত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই না তাহার নিকট শুনিয়াছি। সে-সব পূর্ণ করিবার পক্ষে অজয় কি মাত্র এই কয়দিনেই তাহার ইহজীবনকে একেবারে অযোগ্য মনে করিল, অথবা আমরাই অতি সোহাগে তাহার ইহসংসারের জয়যাত্রার পথে অন্তরায় ঘটাইলাম। তাই কি অভিমানক্ষুব্ধ সে অন্যপথে—অন্যলোকে—অন্য সাহচর্যে চলিয়া গেল? কে জানে,—কে এই জন্ম মৃত্যুর আসা-যাওয়ার রহস্য ভেদ করিবে?

অজয় নাই। আজ তাহার কতদিনের কত কথাই না মনে পড়ে, ভাষায় তাহা আঁকিবার নয়, আঁকিবার শক্তিও আমার নাই। ১৯২৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ক্লাসে অজয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। প্রতিদিনের দেখাশুনায়, আলাপ-আলোচনায় ক্রমে সেই পরিচয় হৃদ্যতায় পরিণত হয় এবং ক্লাসের অন্যান্যের 'অজয়বাবু' আমার হইয়া উঠেন 'অজয়', সকলের 'আপনি' আমার 'তুই' 'তুমি'। সেই হইতে বিগত ১৬টি বৎসর সে ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, অকৃত্রিম সুহৃদ, জীবনের অনেক ক্ষেত্রে উপদেষ্টা। তাহাকে হারাইয়া আমি অনেক কিছু হারাইয়া ফেলিয়াছি, সে ক্ষতি আর পূর্ণ হইবার নয়।

ক্লাসের পড়ায় তাহাকে বড় একটা মনোযোগ দিতে দেখিতাম না, বাসায়ও পড়িত সে অতি অল্পক্ষণই। কিন্তু কোনও আলোচনায় বসিয়া দেখিতাম পড়ুয়া এবং মনোযোগী আমাদের চেয়ে সে কোন বিষয়ে কম ওয়াকিব-হাল নহে। ইহার কারণ, তাহার ধীশক্তি ছিল অনন্য-সাধারণ; অপরের পক্ষে যাহা চেষ্টা করিয়া বুঝিতে হইত, অজয় তাহা মাত্র একটিবার দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া বুঝিয়া লইত। কিন্তু সে ছিল যাহাকে বলে 'আত্মকেন্দ্রী',

কোনও বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ করিয়া সহপাঠীদের বা অধ্যাপক মহাশয়দের নিকট নিজকে প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা কি প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে এম, এ ক্লাসের দুই বৎসরের মধ্যে কোনদিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ডেস্কের উপর আঙুলে তাল ঠুকিয়া ঠুকিয়া কতদিন কত গান সে রচনা করিয়াছে, গ্রীবা দোলাইয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে কতদিন কত গানের আবৃত্তি করিয়া সে আমাদিগকে শুনাইয়াছে। অনেকে আজও এরূপ মনে করেন যে, এম, এ-তে যাঁহারা বাংলা পড়িতে যান, তাঁহারা ইংরেজি ভাল জানেন না বলিয়াই যান। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা বিজাতীয়, সঙ্কীর্ণচিন্তাপ্রসূত ও ভ্রান্ত। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এম-এর বাংলা কোঠায় পা দিবার পূর্বে পড়ুয়াকে অন্যান্য বিষয়ে এম, এ পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়েই ইংরেজিতে লিখিয়া পড়িয়া বলিয়া আসিতে হয় এবং সেখানে আসিয়াও তাহাকে অনেক বিষয়েই (paper) ইংরেজির শরণাপন্ন হইতে হয়। আর এম-এ ক্লাসটি কোনও ভাষা শিখিবার জন্য নয়, ভাষা যাহা শিখিবার তাহা স্কুল-জীবনেই একরূপ প্রায় শেষ হইয়া যায়। আমার এই কয়টি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে পূর্ব্বাক্তরূপ কেহ যেন মনে না করেন যে অজয় ইংরেজি ভাল জানিত না বলিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ক্লাসে বঙ্গ সরস্বতীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। আমি যতদূর জানি অজয়ের মত অত সুন্দর প্রায়ই ইংরেজি লিখিতে অতি অল্প লোকেই পারে। (বৈদেশিক সাহিত্যে তাহার অগাধ জ্ঞান ছিল, হয়তো ইচ্ছা করিলে বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অতি উপাদেয় তুলনামূলক সমালোচনা গ্রন্থ সে আমাদের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিত) আত্মকথায় এতি গভীর অনুরাগ বশতঃই যে সে অত পথ পরিত্যাগ করিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সুন্দরের পূজারী ছিল সে, তাহার সব কিছুই ছিল সুন্দর—চলন বলন লিখন। একটি বিষয় বালক স্বভাব সুলভ হইলেও না বলিয়া পারিতেছি না। স্কুলের অল্প বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই একটা বাতিক দেখা যায়—নূতন বই কিনিয়া যাহার হাতের লেখা সুন্দর তাহাকে দিয়া নাম লেখানো। অজয়ের হাতের লেখা আমার কাছে এত সুন্দর লাগিত যে, এম, এ ক্লাসের অনেক পুস্তকেই তাহাকে দিয়া আমি নিজের নাম লিখাইয়া লইয়াছি।

পড়া শেষ করিবার পর কিছুদিনের জন্য আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়। সংসারে অর্থের যে খুব একটা প্রয়োজন আছে, তদভাবে মানুষের আবাল্যের সমস্ত সোণালি সঙ্কল্প যে বিফল হইয়া যায়—অজয় প্রথম জীবনে এই অতি বড় সত্যটা যেন উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছিল। তাহার সুন্দর তাহাকে কাঁদাইত, সেই সুন্দরের পূজাতেই সে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু অর্থের ডাক তাহার সে যাত্রাপথে আপাততঃ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। পরবর্তী জীবনে সে অনর্থ যে কাটিয়া গিয়াছিল এবং অর্থ যে তাহার একটুখানি মুখের হাসি, একটুখানি হস্তস্পর্শ লাভ করিবার জন্য সময়ে অসময়ে তাহার দোরগোড়ায় আকুলি বিকুলি করিত তাহা আমরা দেখিয়াছি।

যতদূর জানি, কোনও বন্ধু বা মতবাদ সম্পর্কে সে কোনও পূর্বসংস্কারগ্রস্ত ছিল না। সে দুনিয়াটাকে এবং দুনিয়ার সব কিছুকে উদার ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিত। আমরা অনেক সময় অল্পেতেই কাহারও সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা করিয়া বসি, কিন্তু অজয় সেরূপ ছিল না, পরনিন্দার ক্ষেত্রে সে ছিল স্বল্পভাষী, অনেকটা উদাসীন। তাহার উক্তি ছিল সতেজ, যুক্তি ছিল অকাট্য, ধীশক্তি ছিল অসাধারণ। তাহার সাহচর্যে যখনই গিয়াছি আনন্দ পাইয়াছি। কি সুন্দর ছিল তাহার কথা বলবার ভঙ্গি!

সেই সুন্দর ভঙ্গি, সেই মিষ্ট কথা সে বাংলা ভাষাভাষী সকলের জন্য রাখিয়া গিয়াছে তাহার গানে, কবিতায়।

প্রগতি যুগে আমাদের জন্ম এবং অজয় ছিল যথার্থ প্রগতিবাদী। কিন্তু তাই বলিয়া সে আলেয়ার পশ্চাতে ছোটে নাই বা দেশবাসীকেও সেদিকে ছুটিতে ইঙ্গিত করে নাই। তাহার প্রগতিবাদ ছিল গঠনমূলক, যুগের প্রয়োজনে যেরূপ যতখানি করা যুক্তিযুক্ত, ততখানি করারই সে পক্ষপাতী ছিল অযথা প্রাচীন পুরাতনকে উপেক্ষা করিয়া বা অশুভ অস্বাস্থ্যকর নূতনের উদ্বোধন করিয়া আমাদের এতটুকু ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবার দম্ভ সে দেখায় নাই। দেখিয়াছি, পুত্রের পাঁচ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া সে তাহার যথাশাস্ত্র 'বিদ্যারম্ভ' করাইয়াছে, পুত্রকে পণ্ডিত মশাইর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতে শিখাইয়াছে; কিন্তু তাহাকে টোলে ভর্তি করায় নাই বা কুক্কুটির পালক মাড়াইয়া ঘরে আসিলে গঙ্গাজল ছিটায় নাই; আবার কতক্ষণের জন্য ক্লাসের পড়ার বই রাখিয়া খবরের কাগজের খেলাধুলার পাতাখানায় চোখ বুলাইলেও তাহার প্রতি ধমকাইয়া উঠে নাই।

অজয়ের আর একটি বিশেষ গুণ ছিল অতি প্রত্যুষে শয্যাগত এবং নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমন। এই অভ্যাসটি আজকাল তাহাদের বয়সী অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না। তাল নারিকেল খেজুর বাগান ভেদ করিয়া লেকের অপর পারে সূর্য যখন উঠি উঠি করিতেছে, অজয়কে দেখিতাম কোনও বন্ধুর সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিয়া যাইতেছে। মৃদু হাসিয়া বলিতাম, 'তোমার শেষ, আমার আরম্ভ।' স্মিত মুখে গ্রীবা নাড়িয়া সেও সায় দিত। আজ যখন সেই পথে, সেই দীপ্ত প্রভাতে আবার চলি, পথকে বলি, 'ওরে হতভাগ্য, তার চরণ-ধ্বনি আর তুই শুন্‌বি না; যে তোকে ভালোবাসতো, বর্ষা শীত উপেক্ষা করে যে তোর কাছে ছুটে আসতো, সে আর নাই।' প্রভাত-সূর্যকেও বলি, 'হে অরুণ, তোমাকে প্রতিদিন যারা সর্বাগ্রে বন্দনা করে, তাদের মধ্যে এমন একজনকে হারিয়েছ যে সত্যই তোমাকে ভালবাসতো! তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে না পেলে সত্যই দিন যেন তার বিফলে যেতো।' আমার মনের সেই অবস্থায় বিশ্বকবির একটি কবিতা আমার চিত্তে পরম সান্ত্বনার বাণী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়:—

"যখন প'ড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে

* * * *

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় ক'র্‌বে খেলা এই আমি
নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাই বা আমায় ডাকলে।"

আজ আমি এখানে কবি, গীতকার, চলচ্চিত্রের পরিচালক অজয়বাবু সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না; তাহা বলিবার সময়ও এখনও হয় নাই। পুস্তকাকারে তাঁহার রচনা অতি অল্পই বাহির হইয়াছে। বাংলা সাময়িক পত্রের পাতায় তাঁহার অসংখ্য রচনা ছাড়াইয়া রহিয়াছে; সেই সকল পত্রের অনেকগুলিই আবার এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অজয়বাবুর গুণগ্রাহী বন্ধুরা এবং বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীরা সে সকল খুঁজিয়া পড়িয়া তাঁহার রচনার একটি পূর্ণাবয়ব সঙ্কলন-গ্রন্থ অবশ্যই প্রকাশিত করিবেন এবং বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার তাহাতে আরও সমৃদ্ধ হইবে,—এ বিশ্বাস আমার আছে। বাংলার গীতকার জগতের

উদয়-ভানু, দুস্থ ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত মানব জগতের আনন্দ পরিবেশক, কবি অজয় ভট্টাচার্যকে আর আমরা দেখিব না বটে কিন্তু তিনি মহাকালের 'সোণার তরী'তে যে ফসল তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, পরিমাণে তাহা স্বল্প হইলেও পরিপুষ্ট, সুপরিপক্ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ, উহা কাহাকেও পীড়া দিবে না। অদূর ভবিষ্যতে যথাসময়ে সুধীজন তাহার বিচার করিবেন। আজ আমি বন্ধুবর অজয়কে স্মরণ করিয়া তাহার ব্যক্তিগত জীবনের মাত্র দুই একটি বৈশিষ্ট্যের কথাই বলিলাম। তাহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা আরও অনেক কথাই বলিবেন।

অজয়ের 'ছদ্মবেশী' আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমাদের পরিচিত বেশে না হউক, ছদ্মবেশে অসংখ্য বন্ধুবান্ধবের সহিত সে তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহার সেই তৃপ্তির হাসি চর্মচক্ষে দেখিতে পারিলাম না! আমাদের মন আজ কেবলই বলিতেছে, 'এমন দিনে সে নাই!'

"১৯৪২"-এর সাফল্য

বর্ত্তমান যুদ্ধ-সঙ্কট ও আর্থিক বিপর্য্যয়ের দিনেও হিন্দুস্থান যে ক্রমোন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, ইহা কোম্পানীর সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৪২ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী হইতেই উপলব্ধি হইবে; নিম্নের আর্থিক পরিচয়ে সোসাইটির প্রভূত সাফল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

——আর্থিক পরিচয়——

নূতন বীমা	প্রায় তিন কোটি টাকা
মোট চলতি বীমা	১৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৪ „ ৭৪ „ „ „
মোট সম্পত্তি	৫ „ ১৯ „ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৪২)	২ „ ৭৫ „ „ „
প্রিমিয়ামের আয়	প্রায় এক কোটি টাকা

জীবন যাত্রার অনিশ্চিত পথে জীবন বীমা মানুষের প্রধান পাথেয়। হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই পাথেয়ের অন্যতম।

হেড অফিস—
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

অজয়দা

—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—

[শ্রীযুক্ত আশু বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের সহকারীরূপে কাজ করে এসেছেন। অজয় বাবু ও বাংলার অপরাপর গীতিকারদের নিয়ে ভাদ্রসংখ্যা রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত এঁর একটী সমালোচনা পাঠকদের প্রশংসা পেয়েছিল। শিক্ষার্থীরূপে অজয় বাবুর সংগে তার পরিচয়, অজয় বাবুর চরিত্রের অপর একটী দিকের কথাই প্রকাশ করে।]

১৯৩৮ সালের মার্চ্চ মাস। অজয়দাকে প্রথম দেখি নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে। তার আগে তাঁর নাম শুনেছিলাম, লেখা পড়ছিলাম, তাঁর রচিত গান শুনেছিলাম গ্রামোফোন রেকর্ডএ। কাব্যজগতে রসসৃষ্টির বিরাট সম্ভাবনীয়তা যে তাঁর মধ্যে আছে এ ধারণা তাঁকে দেখবার আগেই আমার মনে প্রবল ভাবে বর্ত্তমান ছিল। তাঁকে মুখোমুখি দেখবার সৌভাগ্য প্রথম যেদিন হ'ল সেদিন তাঁর যে রূপ আমার কল্পনায় ছিল তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাঁর প্রশান্ত ললাট, শান্ত সমাহিত চোখের দৃষ্টি যে কোনও লোককেই মুগ্ধ কোরত। ইতিপূর্ব্বে আমি মনে মনে তাঁর ভক্ত হ'য়ে পড়েছিলাম ব'লে তাঁর চেহারা আমাকে নিরাশ করবে এমন আশঙ্কা ছিল; কিন্তু দেখা গেল তা' অমূলক। আমি একজন কল্পনা প্রবণ দরদী শিল্পীকেই দেখলাম। আমার মত তুচ্ছ শিক্ষানবীশের সঙ্গে (সে সময় আমি শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের অনুগ্রহে চিত্র পরিচালনায় শিক্ষানবীশী করছি) তিনি যে সহজ ভদ্র ব্যবহার করলেন এবং অমায়িক ভাবে কথাবার্ত্তা বললেন তাতে তাঁর সৌজন্যে আমি অভিভূত হ'লেম। অজয়দার পাণ্ডিত্য সাধারণ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মারও অভাব ছিল না, কিন্তু গর্ব্বিত হওয়া কাকে বলে তিনি তা' জানতেন না। তাঁর রচনার প্রশংসা তাঁর কাণে গেলেই তিনি সে স্থান ত্যাগ করতেন। কোনও প্রশ্ন নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'লে তিনি সকল কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও সময় ক'রে নিতেন শিক্ষার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করতে। আমার মত বহু কনিষ্ঠকর্ম্মী এই সুযোগ পাওয়ার জন্যে তার কাছে ঋণী। কর্ম্মস্রোতে অজয়দার সহচর হ'বার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত আমার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গেই কেটেছে। কিন্তু চিত্র পরিচালকরূপে অজয়দা কাজ আরম্ভ করবার সময় থেকে আমাদের বন্ধু ৺উমা ভাদুড়ী (ইনি শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের সহকারী রূপে কাজ ক'রছিলেন এবং অনুমান এক বৎসর পূর্ব্বে একটি ট্রেণ দুর্ঘটনায় এঁর মৃত্যু হয়) অজয়দার সঙ্গে ছিলেন। অজয়দার সৌজন্য এবং প্রতিভার যে প্রশংসা আমরা ৺উমা ভাদুড়ীর মুখে শুনতাম তা' এতটুকু অতিরঞ্জিত নয়। তাঁর চিন্তধারা এবং বলিষ্ঠ কল্পনা উপযুক্ত সুযোগের অভাবে হয়ত কোনও ক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট হয়নি, কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার উত্তরোত্তর বিকাশ যে আমাদের চিত্রশিল্পকে সমৃদ্ধতর করত এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কাব্যজগতে অজয়দার স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দান কেবল বিশিষ্ট নয়, বিস্তৃত। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাঁর প্রিয়জনের দুঃখে সমবেদনা জানাই।

জাতীয়তাবাদী অজয় ভট্টাচার্য

—বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়—

[শ্রীযুক্ত বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় অজয় বাবুর জেলাবাসী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশ সেবায় ব্রতী হ'ন। তরুণ অজয় ভট্টাচার্যের দীপ্তিকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমানে ইনি পূর্ব্বাশা পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট]

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় বাংলার মধ্যবিত্ত যুবমনে তখন সন্ত্রাসবাদের বীজ ভ্রূণায়িত হচ্ছিল। আমি সবে মাত্র কৈশোর অতিক্রম করে তারুণ্যের পথে পা দিয়েছি। তারুণ্যের প্রথম সংঘাতে মন ভরপুর। বুকভরা নূতন আশা। নূতন সমাজ সৃষ্টির উন্মাদনা। চোখে নূতনের নেশা। সমাজ মনের তদানিন্তন পারিপার্শ্বিকের সমস্ত দোষ গুণসহ এক অজানা শক্তির টানে সামনের পানে ছুটে চলেছি। অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করার চাহিদায়।

এমনি বয়ঃসন্ধিক্ষণে আমার সাথে অজয়দার প্রথম পরিচয়। অজয়দার আবাল্য প্রিয় সহচর পরিবেষ্টিত কুমিল্লা সহরে। আমি মাত্র গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি। নূতন পরিবেশে, নব আবেষ্টনীতে নিজকে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে তখনও পারিনি। যে তরুণ যুবক আমাকে সবচেয়ে তখন আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছিল। অনুকরণ প্রিয় রোমাণ্টিক মন যার হাব ভাব আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিল —তিনি আর কেউই নন, কুমিল্লা সহরের সর্বজনপ্রিয় অজয় ভট্টাচার্য।

প্রথম বার্ষিকশ্রেণীর ছাত্র আমরা। বাংলার বধূর মতো অনেকটা অবস্থা। আধো লাজুক। আধো ভাবুক। মনের কোনে নানা স্বপ্নে রঙিন হয়ে উঠে কিন্তু মুখ ফুটে বলতে ভয়।

কলেজের সেরা ছাত্র অজয়দা, সাহিত্যক্ষেত্রে উদীয়মান অজয়দা, খেলাধূলা উৎসাহী অজয়দা, নাটকে অজয়দা। এক কথায় সেদিনের ছাত্র সমাজের চঞ্চল প্রাণের প্রতীক অজয় ভট্টাচার্য।

চায়ের দোকানে নানা বয়সি জনকয়েক বাছা বাছা বন্ধু নিয়ে আড্ডা দেয়া অজয়দার খেয়ালী মনের বিলাস ছিল। আমিও আস্তে আস্তে অজয়দার গুণমুক্ত ভক্তদের মাঝে আমার ঠাঁই করে নিয়েছিলাম। ক্রমশঃ যত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁর সাথে মিশবার সুযোগ পেয়েছি ততই তাঁর অন্তরের বিচিত্র ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে গেছি।

সেদিনের ভাল ছেলে তাঁদেরই বোঝাতো, যারা সরকারী দপ্তরে কেরাণী তৈরীর যন্ত্র হিসাবে নিজকে তৈরী করতে পারতো, এবং ব্যতিক্রম প্রথম অজয়দার ভেতরই দেখতে পাই। কলেজের সেরা ছেলে হয়েও তিনি ডাংপিটে ভবঘুরে ছেলেদের সাথে হুলোড় করে বেশী আনন্দিত হতেন। নিজ স্বাতন্ত্র্যে সেদিনের ছাত্র সমাজের তিনিই ছিলেন কর্ণধার। আমাদের সময়ে তিনি সব ব্যাপারে ছাত্র সমাজের মুখপাত্র হিসাবে কলেজে কর্তৃপক্ষের সাথে নানা অভাব-অভিযোগ নিয়ে লড়াই করেছেন।

একটি বিশেষ ঘটনার কথা আজও আমার মনে আছে। যার জন্যে তাঁকে কলেজ হতে বহিষ্কারের ভয় প্রদর্শন করতেও কলেজ কর্তৃপক্ষ কসুর করেননি। কিন্তু অজয়দা তাতে দুঃখীত না হয়ে সমস্ত ছাত্র সমাজের মুখ রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন। আমাদের প্রধান দর্শন অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ছাত্রবন্ধু ছিলেন। তিনি হঠাৎ মারা যান। কলেজ হলে দেবেনবাবুর শোক সভা নিয়ে

ছাত্রদের সাথে তদানিন্তন অধ্যক্ষ সত্যেন বসু মহশয়ের সাময়িক বিরোধ উপস্থিত হয়। অজয়দার নেতৃত্বে ছাত্ররা কলেজ হলে শোক সভার দাবী জানায়। অধ্যক্ষ মহাশয় আপত্তি তুলে অজয়দাকে কলেজ হতে বহিষ্কারের ভয় দেখান কিন্তু অজয়দা যা একবার সত্য বলে বুঝতেন তার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে স্থানীয় মহেশ প্রাঙ্গণে সাধারণ সভার আয়োজন করান। পরে অধ্যক্ষ মহাশয় উপস্থিত হয়ে অজয়দার আয়োজনকে সাফল্য মণ্ডিত করে তোলেন।

জাতীয় আন্দোলন তখন অন্তর্মুখী। জনসাধারণ তখনও এ আন্দোলন ব্যাপকরূপে গ্রহণ করেনি। যতদিন কুমিল্লায় ছিলাম প্রত্যেক জাতীয় আন্দোলনের স্পন্দনের সাথে অজদার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমরা লক্ষ্য করেছি। তিনি নানা ভাবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের তখন সাহায্য করেছেন।

মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন ভারতের সর্ব্বজনমান্যা জাতীয় মহা সভার নেত্রী সরোজিনী নাইডু কুমিল্লা যান। সেদিনও কুমিল্লার ছাত্র সমাজের পক্ষে তিনি অভিভাষণ রচনা করে দেন। তার পরে যত জাতীয় নেতা কুমিল্লা গিয়েছেন অজয়দা তাঁর রক্ত লেখনীতে তাঁদের সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাইতো পরবর্ত্তী জীবনে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তার উন্মাদনাপূর্ণ গান গুলো বাংলার তরুণের কণ্ঠে গীত হয়ে তাদের জয় যাত্রার পথে পাথেয় যুগিয়েছে। কুমিল্লার এই তরুণ কবির "প্রভাত ফেরীর" গান আজও গীত হয়ে থাকে কারা প্রাচীরের অন্তরালে সেই সব সৈনিকের কণ্ঠে—যাদের চোখে জাতীয় মুক্তির স্বপ্ন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ, ভারত নর-নারীর চির স্মরণীয়
—মোগল সম্রাট—
জাতীয়তার মিথ্যা ভাণ যেখানে ছিল না—যাঁর চোখে সবাই মানুষ সেই

শাহান্‌শা আকবর

কলিকাতায় শীঘ্রই আসছে। কমলরায় পিকচার্সের গৌরবময় অবদান
শ্রেষ্ঠাংশে: কুমার, বনমালা, হুসনাবানু, আজুরী, কে, এল সিংহ প্রভৃতি।

নেপচুন পিকচার্সের
জি গোমার
নবীনচন্দ্র ও লীলা পাওয়ার

ইষ্টার্ণ পিকচার্সের
বাদল
জহর রাজা, রাধারাণী ও উর্ম্মিলা

চিত্রবাণী লিমিটেড

অজয় কর্তা

—শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

[শ্রীযুক্ত চিত্ত ঘোষ চলচ্চিত্র সাংবাদিক থেকে ক্রমে ক্রমে এই শিল্পের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমানে অরোরা ফিল্মস কর্পোরেশনের সংগে সংশ্লিষ্ট। অজয় বাবুর সংগে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।]

মরণের চেয়ে ধ্রুব সত্য পৃথিবীতে খুব কমই আছে। সূর্য্যের উদয় পূর্ব্বদিকে আর অস্ত পশ্চিমে, এটাও ধ্রুব সত্য। তথাপি মেরুপ্রদেশের সুদীর্ঘ যামিনীতে সূর্য্যের উদয়াস্তের সংবাদ আমরা পাই না। এই দীর্ঘ রজনীতে যদি কোন এস্কিমো বা ল্যাপ বলে, যে দীর্ঘ রাত্রিতে উদয়াস্ত দেখি না তাকে বুঝান শক্ত। কিন্তু মৃত্যুর ব্যতিক্রম নেই।

তথাপি যখন অজয় বাবুর আকস্মিক মৃত্যুর কথা প্রথম শুনলাম তখন সেটা বিশ্বাস করতে পারিনি। এই চিরন্তন সত্য এত শীঘ্র আসবে তা আমি কল্পনা ক'রতে পারিনি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কাব্যের জগতে নয়, যদিও তাঁর কবি প্রতিভা আমাকে খুবই আকর্ষণ ক'রেছিল। আমি তখন রাধা ফিল্ম কোম্পানীর কর্ম্মসচিব। তাঁর লেখা গান আমার খুবই ভাল লাগত, ইচ্ছাও ছিল রাধা ফিল্মের ছবিতে তাঁর গান দেব। ভবানীপুর পূর্ণথিয়েটারের আপিসে তাঁর সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হল, তখন আমি একরকম এটাই বুঝে ছিলাম যে নিউ থিয়েটার্সের ছবির জন্য গান লেখায় তিনি খুবই ব্যস্ত, তার উপর আবার তীর্থপতি স্কুলে ছেলেদের পড়াবার জন্য অনেক সময় কাটাতে হয়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সংসার যাত্রা সুখের বা আরামের নয়, তাই এসব কাজ ছাড়া তাকে একটী ছাত্রকে পড়াতে হ'ত তার বাড়ীতে। আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম তার সময়ের অভাবে, কারণ রাধা ফিল্ম-এর ছবিতে গান দিতে হলে অনেকদিন সেখানেও যেতে হ'ত। তবে আমি তাকে কয়েকবার বলেছি যে আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর সাহায্যের, তবে ভবিষ্যতের জন্য সেটা মুলতুবি ছিল। একদিন কথায় কথায় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন যে সিনেমায় কোন গান আমার ভাললাগে। আমি তখন উত্তর দিয়েছিলাম যে সময় একটা দুঃখের রেখাপাতের দরকার সেই সময়ের জন্য যে গান লেখা হয়েছে তাই আমার কাছে ভাল। আমি বার বার বলেছি যে তার লেখা—

বাঁধিনু মিছে ঘর ভুলেরি বালুচরে—
উজান ধারা আসি ভাঙ্গিল চিরতরে।
যে তরু পেল প্রাণ আমারই আঁখি নীরে
সে কিরে হাঁসিবে না মধুর ফুল ফলে।

শুনে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি। তার কারণ শুধু যে ভাল লেখা সেজন্য নয়, তাতে কবি নিজের প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন। এত ব্যথা এত সজীবতা পূর্ণমাত্রায় ঢেলে দিয়ে এ গানকে মূর্ত্ত ও সজীব করা হয়েছে। তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন "কেন আনন্দের গান—'আমার সাত মহলা বাড়ী' ইত্যাদি তাকি আমার প্রাণ ঢালা নয়?" আমি জবাব দিয়েছি—লেখা ভাল, কিন্তু প্রাণ ঢালা লেখা নয়,—অবশ্য আমার ভুল হতে পারে কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কোন তর্ক তোলেন নাই। সে সঙ্গে আমি আরও বলেছিলাম যে, গানে প্রেমের কথা থাকলেই ঠিক প্রেমের গান হয় না। কবির লেখা ২।১টা প্রেমের গান ভাল আছে তাঁর লেখা—"প্রেম নয় সে আমার মৃদু ফুল হার" ভাল লেখা, কিন্তু গোড়ার ছত্রে প্রেম মূর্ত্ত নয় ক্রমশঃ তার

অভিব্যক্তি ভাল হয়েছে যখন সে প্রেমের সঙ্গে দুঃখের বন্যা এসে মিশেছে।

দিনের পর দিন তার সঙ্গে মিশেছি। আলাপ আলোচনা অনেক বিষয়ে হয়েছে—কিন্তু তাঁর একটা বিশেষত্ব দেখেছি যে যেসব বিষয় তিনি পড়ে গল্পচ্ছলে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাতে তিনি অপূর্ব্ব অভিব্যক্তির পরিচয় দিয়েছেন। লেনিন সম্বন্ধে তিনি অনেক পড়েছেন, লেনিনের দোষও তিনি অনেক দেখিয়েছেন Vladimir থেকে Lenin হওয়া এবং Leilaর মৃত্যুর কথা বলে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার ধারার জন্য এতবড় একটা অন্যায়ের সমর্থন করা যায় না। আমি বলেছিলাম দোষ ত্রুটি নিয়ে মানুষ—কিন্তু তাকে বিচার করতে হ'লে পৃথিবীতে তার দান, দেশের জন্য ত্যাগ, এই সব দেখেই বিচার করা সমীচীন। উত্তর ভালই দিয়েছেন—মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে এত বড় একটা দেশের নেতাকে সামান্য একজন মানুষের মানদণ্ডে বিচার করা ঠিক নয়, কারণ নেতার জীবনী থেকেই ভবিষ্যত মানুষ জীবন গঠন করতে চাইবে।

রাধা ফিল্মের জীবন ফুরিয়ে এল আমি বললাম "অজয় কর্ত্তা--আর ভাল লাগে না এ জীবন" তিনি দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন "যখন আমিও আস্তে আস্তে এ জগতে আসছি তখন আপনি চলে যাবেন"। নিয়তির ক্রুর পরিহাসে আমাকে আবার ফিরে আসতে হল, ফিল্মএর অভাব হল, তখন অজয় বাবু বললেন "এইবার আমাকে একটু সাহায্য করবেন।" সাহায্যের সময় এসেছে কিন্তু পরপারের ডাক তাকে অকালে নিয়ে গেল। হতভাগ্য আমরা তার শেষ বুঝলাম না, দেখতেও পারিনি। জানি না আর কোন জগতে দেখা হবে, এ নিরালা সংসারে পারের কড়ি সংগ্রহ করছি—আহ্বান কবে আসে কে জানে?

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত—১৯২৯

গ্রাম—'যখের ধন' ফোন—ক্যাল ঃ৩৭৩৪

হেড অফিস ঃ—

৩৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

শাখাসমূহ।

বড়বাজার	মাণিকতলা	বালিগঞ্জ
শিয়ালদহ	মেদিনীপুর	বালিচক
শালবনী	বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর
কৃষ্ণনগর	খুলনা	বাগেরহাট
মিরকাদিম	হবিগঞ্জ	তেজপুর
পাবনা।	শ্যামবাজার	পাটনা
গড়বেতা	ঘাটাল	রাঁচী

বাগেরহাট আমলাগোরা

সর্ব্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

রথীন কর, সেক্রেটারী — কালীচরণ সেন, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীমতী বনমালা.....

সৌভাগ্য পিকচার্সের 'মাসকারাদাং' চিত্রে দেখা যাবে। চিত্রখানি মেট্রো-পলিটান ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায় প্রদর্শিত হবে.....

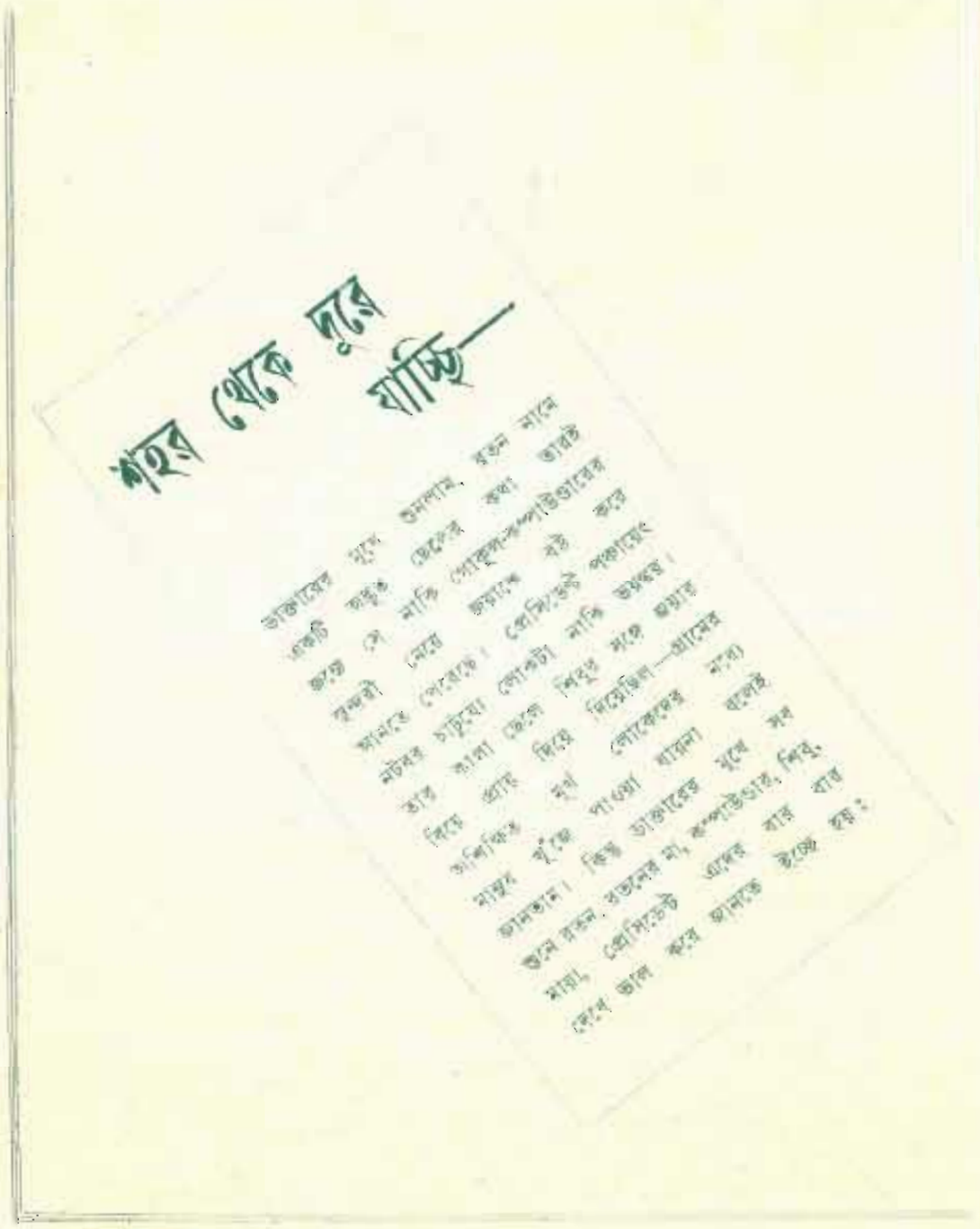

ছদ্মবেশী ঃ

প্রযোজনা: ডি, লুক্স পিকচার্স। পরিবেশনা: পরশমল দীপচাঁদ। পরিচালনা ও চিত্রনাট্য: অজয় ভট্টাচার্য। কাহিনী: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালক: কুমার শচীনদেব বর্মা। শব্দগ্রহণ: শম্ভু সিং। চিত্রগ্রহণ: প্রবোধ দাস। চরিত্র চিত্রায়ণে: ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্র মুখার্জি, শৈলেন চৌধুরী, মিহির ভট্টাচার্য, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় রণজিৎ রায়, পদ্মা দেবী শান্তি গুপ্তা, সন্ধ্যারাণী, পূর্ণিমা, মীরা দত্ত প্রভৃতি।

৺অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত ছদ্মবেশী পূরবী, পূর্ণ উত্তরা ও আলেয়া'তে প্রদর্শিত হচ্ছে। ছদ্মবেশী অজয় বাবুর দ্বিতীয় চিত্র। তাঁর প্রথম ছবি অশোক মডার্ণ টকীজের প্রযোজনায় গৃহীত হয়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় যে এই নবীন পরিচালক মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে অকালে মারা গেলেন। বাংলার চিত্রামোদীরা এতদিন গীতিকার অজয় ভট্টাচার্যের সংগেই পরিচিত ছিলেন। অশোক চিত্রে সর্বপ্রথম তিনি পরিচালকরূপে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন। অশোক চিত্রে পরিচালনা নৈপুণ্যের এমন কিছু তিনি পরিচয় দিতে না পারলেও তাঁর ভিতর যে পরিচালনা নৈপুণ্যের সম্ভাব্য ছিল—একথা প্রকট হয়ে উঠেছিল। ছদ্মবেশী তাঁর দ্বিতীয় এবং শেষ ছবি। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মবেশী উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে এর আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে—কাহিনী খুব হালকা ধরণের, একে প্রধানতঃ কৌতুকচিত্রই বলবো। দুঃখ কষ্ট জর্জরিত বাঙ্গালীর জীবনে হাসি খুঁজে পাওয়া দায়। অজয় বাবু যেমনি গান রচনা করে বাঙ্গালীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন—তেমনি ছদ্মবেশীতে বাঙ্গালী দর্শকদের হাসাবার কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। এদিক দিয়ে ছদ্মবেশীতে পরিচালকরূপে তিনি তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। মূল কাহিনীর সংগে যোগ টেনে এনে তিনি নিজের সৃষ্ট আর একটী সমস্যা এই চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন যা দেখে তাঁর সত্যিকারের দরদশীল প্রগতি মনেরই পরিচয় মিলবে। এই টুকরো আখ্যানভাগটীতে তিনি নির্যাতিত—প্রতারিত মানুষের পক্ষে হয়ে—নির্যাতনকারী প্রতারক মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন। সে অভিযোগ শুধু তাঁর ছদ্মবেশীর রূপালী পর্দায়ই ফুটে উঠে নাই—সারা দুনিয়ার ক্ষুব্ধ জনশক্তি এক দুর্দমনীয় শক্তিতে ছুটে চলেছে এই অভিযোগের সমাধান করতে। অজয় বাবুর প্রগতি মন স্পষ্ট করে জানতে পেরেছিল মানুষের প্রতারণা—ছল চাতুরীর পালা শেষ হ'য়ে এসেছে—আকাশের বুকের ঘন-ঘটায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মহাপ্রলয়ের আর বাকী নেই। সমুদ্রের গর্জন দূর থেকেই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন—তাই পারের যারা যাত্রী তাদের এই মহাপ্রলয়ে ঝাপিয়ে পড়বার জন্য হাক ছাড়লেন:

"বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সব
জোয়ার এসেছে আজ!
ময়ূর-পঙ্খী ডুবে গেল ভাই,
ভাঙ্গা জাহাজেরি কাজ,
বেলোয়ারি ঘরে ফাঁকির ফানুষ
তোরা নোস ভাই, তোরা যে মানুষ
বুকের পাঁজরে লুকায়ে রয়েছে
শত ইন্দ্রের বাজ।
বিদায়ের বেলা পারিজাত মালা
কেহ দিবে না তো গাঁথি,
হাতে হাত দিয়ে রাখী বন্ধন
এক সাথে চলো সাথী!
পিছনে থাক সে পুরাণো পৃথিবী,
নূতন ফসল ভাগ ক'রে নিবি:
আজিকার এই কাঁটার মুকুট
হবে রে জয়ের তাজ।"

ছদ্মবেশী চিত্রের প্রারম্ভটী চমৎকার। বাংলা বইতে কোন কৌতুক চিত্রের প্রারম্ভ এরূপ নূতনত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। একটা কৌতুক হাসির ভিতর দিয়ে সুর শিল্পী শচীন দেব এমনি ভাবে রাগিণীর গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন—যা সহজেই নির্দেশ দেয় ছদ্মবেশী কোন্ ধরণের চিত্র এবং সংগে সংগে দর্শকদের মনও আকর্ষণ করে। চিত্রের প্রথমার্ধে আমাদের সেরকম কোন অভিযোগ নেই। প্রথমার্ধের দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ গতির সংগে মনও চিত্রের

সংগে সংগে ছুটে চলে। দ্বিতীয়ার্ধে—চিত্রখানি একটু ঝুলে পড়েছে। এবং মাঝে মাঝে Humour গুলিও একটু সস্তা বলেই মনে হয়েছে। নায়িকার ফটো নিয়ে জহরের শুয়ে পড়ে গড়াগড়িটা কৌতুকচিত্রের পক্ষেও বিসদৃশ লাগে।

অভিনয়াংশে জহর, ইন্দু মুখার্জ্জী ও পদ্মা দেবীর কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। এই চিত্রে ইন্দু বাবু সত্যই আমাদের খুশী করেছেন।

পরিচালকের সৃষ্ট সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটী ভবঘুরে চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় যে কোন বৈদেশিক অভিনেতার প্রতিভাকেও হার মানিয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। মিহির ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী—দর্শক-দের আনন্দের চেয়ে বেদনাই দেবেন বেশী। সন্ধ্যার পূর্বের মত অভিনয়ে আবেদন নেই কেন? ফটোগ্রাফীর জন্যও তাকে খুব খারাপ দেখিয়েছে। অপর দিকে পূর্ণিমা অল্পক্ষণের জন্য হলেও দর্শকদের মন আকৃষ্ট করবে।

রণজিৎ রায় ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি হলেও উপভোগ্য হয়েছে।

সুর সংযোজনার জন্য শচীন দেবকে আর একবার ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না। তার সুরের নূতনত্ব ও মাদকতা এবং গাম্ভীর্য আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। শব্দ ও চিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়।

চিত্রখানি দেখার পর পরিচালকের অকাল মৃত্যুতে আরও বেশী ব্যাথা অনুভব করছিলাম. এইজন্য, যে ছদ্মবেশীতে তার পরিচালনা নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে—ছদ্মবেশী আমাদের আনন্দ দানে কৃতকার্য হয়েছে—ছদ্মবেশীর এই রূপ—এই গৌরবটুকু তিনি দেখে যেতে পারলেন না।

ছদ্মবেশী চিত্রের সংগে বাংলার এই জনপ্রিয় গীতিকার ও পরিচালকের স্মৃতি জড়িত হ'য়ে রয়েছে আশা করি বাঙ্গালী দর্শক মাত্রেই এই চিত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করবেন।

—নিতাইচরণ সেন

পরলোকে কুমারী অনিমা ঘোষ

গত ২৬শে নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে রূপবাণী ও প্রাইমা ফিল্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী অনিমা ঘোষ অকালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র পনেরো বৎসর হয়েছিল।

কুমারী অনিমা দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। সঙ্গীতকলায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শিনী। ১৯৩৮-৩৯ সালে মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল, টপ্পা ও পুরাতন ধারার বাঙলা গানে পারদর্শিতার জন্য অনেকগুলি পদক ও প্রশংসাপত্র লাভ করেছিলেন। ১৯৪০ সালে এণ্টালী সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কুমারী অনিমা সহজ-সুন্দর অমায়িক স্বভাবের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুসারে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতা ভারতের বিভিন্ন যক্ষ্মা-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য করেছেন।

আমরা কুমারী অনিমার বিয়োগকাতর পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি। প্রার্থনা করি তাঁহার আত্মা যেন অক্ষয় শান্তি লাভ করে।

শহর থেকে দূরে

প্রযোজনা: ইষ্টার্ণ টকীজ। পরিবেশনা: প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮ লিঃ)। রচনা ও পরিচালনা: শৈলজানন্দ। সুরশিল্পী: সুবল দাশগুপ্ত। চিত্রশিল্পী: অজয় কর। শব্দযন্ত্রী: জে, ডি, ইরাণী। ভূমিকায়: জহর, ধীরাজ, নরেশ মিত্র, ফণী রায়, পশুপতি, কানু, আশু বোস, মলিনা, রেণুকা, প্রভা, বাজলক্ষ্মী, রেবা, চিত্রা প্রভৃতি।

শৈলজানন্দ পরিচালিত "শহর থেকে দূরে" গত ২৪শে ডিসেম্বর রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করলো। প্রত্যহ তিনটী, ছুটির দিনে চারটি করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সত্বেও যখনই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে যাতায়াত করা যেত—নিম্ন থেকে ঊর্দ্ধতম সর্বশ্রেণীর আসন যে পূর্ব থেকেই দর্শকেরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন, সেকথা সগর্বে ঘোষণা করবার জন্য সাইনবোর্ডগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঝুলতে দেখা যেত (এখনও যে না যায় তা আমি বলছি না) কোন বাংলা ছবির ভাগ্যলক্ষ্মীকে এরূপ প্রসন্ন অবস্থায় অনেকদিন দেখতে পাইনি।

কেউ বলছেন: Hit Picture যে হবে এটুকু আশা করেছিলাম কিন্তু Supper-hitএর কল্পনাও আসেনি। ঠিক এর বিপরীত মত প্রকাশ করে বসলেন আবার কয়েকজন। বিশিষ্ট দর্শক বলে এঁদের অভিমতও উড়িয়ে দিতে পারলুম না। এঁদের একজন বলেন—নন্দিনী এবং বর্তমান চিত্র দিয়ে শৈলজানন্দ এক [illegible] এঁকে ফেলেছেন। নন্দিনী, বন্দী যারা না দেখেছেন "শহর থেকে দূরে"র বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ থাকবে না যারা দেখেছেন তারা পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু মনে করবেন না। একই ছবির সম্পর্কে দুইটী বিভিন্ন মত [illegible] করে তুললো। গত ৩০শে ডিসেম্বর বেলা [illegible] পক্ষের আমন্ত্রণে "শহর থেকে দূরে" দেখে [illegible] এখানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক [illegible] শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। এঁদের অনেকেরই মতামত জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্লেন 'Supper-hit', কেউ নাক চোখ মুখ সিঁটকে জবাব দিলেন: শৈলজানন্দ যে এ রকম নিরাশ করবেন তা ভাবতেও পারিনি। এঁদের অভিযোগ শৈলজানন্দের 'Class Picture' তৈরী করা উচিত ছিল। "শহর থেকে দূরে" Class Picture নয়। Mass Picture কিনা একথাটা জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা মেনে নিলেন। অবশ্য এই Mass কথাটা চলচ্চিত্র জগতে একটু ভিন্ন অর্থ নিয়ে চলাকেরা করে। এই জগতে Mass অর্থে সত্যিকারের জনগণ নয়—Mass অর্থে Majorityকে বোঝায় এবং এই Majority বলতে চলচ্চিত্র দর্শকদের Majority। Mass Picture বলতে যে ছবি বেশী সংখ্যক দর্শকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম। যাই হোক দু'দলেই স্বীকার করলেন "শহর থেকে দূরে" একখানি Mass Picture হয়েছে। কেবল Class Picture নয় বলে এক দলের ক্ষোভ রয়েছে—তাই তাদের জন্যই দু'চারটী কথা বলার প্রয়োজন মনে করি।

যদি নিছক আনন্দ পরিবেশনের ভান করে হিন্দি চিত্রগুলি বাঙ্গালী দর্শকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বুক থেকে হাজারে হাজারে টাকা লুটে নিয়ে যেতে পারে তবে যে চিত্রের মূলে ষোল আনাই বাঙ্গালীর পরিশ্রম ও অর্থ রয়েছে—সে চিত্র যদি বাঙ্গালী দর্শকদের মনো-রঞ্জন করে তার প্রাপ্যটুকু আদায় করে নিতে পারে—তবে এতে গাত্রদাহ এবং অপ্রশংসারই বা কি থাকতে পারে? বরং এজন্য আমরা পরিচালক শৈলজানন্দ—প্রযোজক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার এবং এই চিত্রের সংগে যে সব কর্মী ও শিল্পীরা জড়িত আছেন তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সাহিত্যিক শৈলজানন্দকে শহর থেকে দূরেতে আমরা হারিয়েছি বলে যদি কারোর অভিযোগ থাকে থাক, কারণ বাংলা-সাহিত্য এমন দীন নয় যে তা থেকে দু' একজন জ্যোতিষ্ক খসে পড়লে তার খুব ক্ষতি হবে। অথচ

চিত্রজগত এতই দীন—এতই নিঃস্ব যে এর প্রয়োজনে অপর ক্ষেত্রে যদি ক্ষতি স্বীকারও করতে হয় তাও করা উচিত। আমাদের ত মনে হয়—শৈলজানন্দ সাহিত্যিক বলেই তার চিত্রের কাহিনীর গতি সরল এবং এমন স্পষ্ট ক'রে তা আত্মপ্রকাশ করে। সেদিক দিয়ে আমরা কী কম লাভবান হয়েছি?

শহর থেকে দূরের আরম্ভটা চমৎকার। শহরের দৃশ্য দেখাতে দেখাতে তিনি নিয়ে গেলেন শহর থেকে দূরে—পল্লীগ্রামে। যে গ্রামে না আছে স্কুল—না আছে পোষ্টাফিস। থাকবার মধ্যে শুধু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ছোট্ট একটি ডাক্তারখানা। গ্রামখানি ছোট। লোকসংখ্যাও কম। এখানে সন্ধ্যাবেলা সরকারী বারোয়ারী তলায় সখের যাত্রার রিহার্সেল চলে—পালা পার্বণের দিনে গাঁয়ের ছেলেরা নেচে গেয়ে সারা গ্রামটাকে একেবারে আনন্দ কলরবে মুখরিত করে তোলে। আনন্দ এবং নিরানন্দ দুই যেন একই খাতে বইতে থাকে। এই গ্রামের ছেলে রতন। বেপরোয়া। গোঁয়ার। নিতান্ত সহজ এবং সাধারণ।

রতন বিয়ে করেছে। স্ত্রী মায়াকে দেখতে শুনতে চমৎকার। রতন তাকে ভালও বাসে খুব। কিন্তু তবু তার দুঃখ ছিল। কোন ছেলে পুলে হ'লো না বলে রতনের মা কারণে অকারণে বধূকে নির্যাতন করতেন। শেষে স্থির করলেন রতনকে আবার বিয়ে দেবেন। মেয়েও ঠিক হ'লো। ডিসপেনসারির কম্পাউণ্ডের মেয়ে জয়ার সংগে তিনি দেবেন রতনের বিয়ে। কিন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নটবর চাটুয্যে খুব ধূর্ত প্রকৃতির লোক। ঠিক করলো তার হাবা ছেলে শিবুকে কম্পাউণ্ডারের মেয়ের সংগে বিয়ে দেবে। কারণ কম্পাউণ্ডারের সঞ্চিত অর্থ যে তার একমাত্র মেয়েই পাবে এ বিশ্বাস তার ছিল।

এদিকে ডিসপেনসারীর নতুন ডাক্তার এসেছে। জয়াদের বাড়ীতেই থাকে। জয়া তার দেখা শুনা করে। দেখাশুনায় আলাপ পরিচয়ে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বেশ একটু অন্যরকম মোড় নিয়েছে—একথা এসংবাদে রতন খুশী। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট জোট পাকিয়ে বলে—এ ডাক্তার গ্রামে থাকতে পারবে না। রতনের ইচ্ছা একজন ভাল ডাক্তার গ্রামে থাক গ্রামীদের প্রয়োজনে—তাই ডাক্তারকে গেয়ে বলে—এটা তোমার বয়সের দোষ না সত্যই তুমি জয়াকে ভালবাস? আমি মুখ্খু শুখ্খু পাড়াগাঁয়ের মানুষ। অনেক দিন থেকে গ্রামের ভাল করবার চেষ্টাই করলাম কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না। কেন জানো—

ডাক্তার বলে, 'কেন?' রতন উত্তর দেয়; এখানে কেউ কাউকে ভালবাসে না। আমি তোমাকে ভালবাসি না তুমি আমাকে ভালবাস না। তা না হয় বাসলে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে দ্যাখো ছেলে মেয়ে হচ্ছে—ঘরসংসার করছে। অথচ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নেই—এদের ভাল করবো বল্লেই ভাল করা যায় না। এমনি করে রতন যখন পরের ভাবনা ভাবছে—তখন বাড়ীতে রতনের মা এবং বৌ এর ঝগড়া এমনি চরমে উঠেছে যে শাশুড়ী গেল রাগ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে, বৌ গেল নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে।

প্রেসিডেণ্টের ছেলে শিবুর সংগে জয়ার বিয়ের বাজনা বাজলো। এদিকে ডাক্তার ভিন্ন গায়ে উঠে গেছে। শেষ পর্যন্ত রতনের কারসাজিতে ডাক্তারের সংগেই বিয়ে হলো জয়ার। আত্মহত্যা করতে যেয়ে রতনের বউ জেলেদের দ্বারা রক্ষা পায়—ডাক্তারই তাকে বাঁচিয়ে তোলে। রতনের মাও সময় মত ফিরে আসে। এই গেল শহর থেকে দূরের মোটা মুটি আখ্যায়িকা। এই আখ্যানভাগটা চিত্রে এমনি সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ গতিতে শৈলজানন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন—যা অতি সহজেই দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হ'য়ে উঠবে। তা ছাড়া প্রত্যেকটি চরিত্র বিশেষ করে রতন, প্রেসিডেণ্ট,

কম্পাউণ্ডার—রতনের মা, এক একটী টাইপ চরিত্রের সৃষ্টি করে এদের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গাঁয়ের যে দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন—সেজন্য শৈলজানন্দ ধন্যবাদেরই যোগ্য।

অভিনয়াংশে—শ্রীমতী মলিনা, প্রভা, রেণুকা, ফণী রায়, নরেশ মিত্র, জহর, ধীরাজ, পশুপতি প্রশংসার যোগ্য। এদের চরিত্রোপযোগী অভিনয় সকলেরই ভাল লাগবে।

শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ ভালই।

সুবল দাশগুপ্তের সুর চিত্রের জমানোর কাজে সাহায্য করেছে। অথবা তার জমাট সুর আমাদের ভাল লেগেছে।

এবার শহর থেকে দূরের ভিতর যে সব দুর্বলতা আমাদের চোখে ধরা পড়েছে তাই নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথম কথা চিত্রের মূল কাহিনী গ্রামকেই কেন্দ্র করে—তাই গ্রামের দৃশ্যাবলী আরও বেশী ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল। গ্রামীদের অনেক সমস্যা ও শোচনীয়তার কথা, কথায় ফুটিয়ে তোলা হলেও—গ্রাম যেন সেই ষ্টুডিও—গ্রামেরই আমরা পরিচয় পেয়েছি। গ্রামের কৃষক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের দুঃখ কষ্ট জর্জরিত জীবন যাত্রা প্রণালীর অন্ততঃ কিছুটা শৈলজানন্দের ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল। মাঝে মাঝে গ্রামের নয়নাভিরাম বহির্দৃশ্য দেখানো হয়েছে—তার প্রশংসাই করবো।

তারপর রতন—রতন যে লোকটী তার স্ত্রীকে এত ভালবাসে—স্ত্রীর গৃহত্যাগে তার কোন প্রকার চাঞ্চল্য নেই—এটাই বা কেমন করে সম্ভব হতে পারে? রতন বেপরোয়া কিন্তু কর্তব্যে কোন সময়ই তার কোন প্রকার শিথিলতার আমরা পরিচয় পাইনি। কথোপকথনের আমরা প্রশংসাই করবো। ভাষা খুব তীক্ষ্ণ—কিন্তু রতন আর কম্পাউণ্ডার এদের মুখ দিয়ে বিশেষ করে এত কথা বলানো হয়েছে—যা কানের পরদায় একটু আঘাত করে।

ডাঃ বিমল বসু

পোষ্যপুত্র ঃ

এক সময় অনুরূপা দেবীর পোষ্যপুত্র উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যেও যেমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তেমনি বাংলা রঙ্গমঞ্চেও প্রতিভাবান অভিনেতাদের অভিনয় নৈপুণ্যে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল। বাংলার প্রাচীন জমিদার বংশের পিতা পুত্রের ভিতর দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতির নিখুঁত রূপ ফুটিয়ে তুলতে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সক্ষম হয়েছিলেন বলেই এই উপন্যাসখানি বাংলা পাঠক-সমাজ ও দর্শকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই জনপ্রিয়তার জন্যই হয়ত প্রযোজক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন বসু উপন্যাসখানিকে পর্দায় রূপ দিতে সাহসী হন। প্রথমেই যে কথাটা আজকের দিনে বলার প্রয়োজন অনুভব তা হচ্ছে, এই ধরণের কাহিনীর এক সময় আবেদন থাকলেও বিভিন্ন সমস্যা জড়িত সমাজের কাছে এর সেরকম কোন মূল্য নেই। কারণ তখনকার যুগে—বিশেষ করে উপন্যাসখানিতে সে সমস্যার সমাধান করতে অনুরূপা দেবী প্রয়াস পেয়েছেন—আজকের দিনে হয় তাকে কেউ কোন সমস্যা বলেই মনে করেন না অথবা সে সমস্যার সমাধান আমরা করতে পেরেছি। তবু এর দাম কিছুটা আছে বৈকী—আছে এইজন্য বলবো যে তখনকার দিনের একটা নিখুঁত রূপ আমরা পাই। পর্দায় রূপায়িত হবারও এই জন্যই এর প্রয়োজনীয়তা কিছুটা আছে। তাই চিত্রখানিকে তখনই আমরা প্রশংসা করবো—যদি দেখি এর সার্থক রূপ ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ Picturisation" ঠিক ঠিক হয়েছে। কিন্তু পরিচালক সতীশ দাসগুপ্ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃত কার্য হতে পারেননি বলেই আমাদের কিছুটা ক্ষোভ থেকে গেছে। সামান্য একটা বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—তাহলেই চিত্র সম্পর্কে আমাদের যা অভিযোগ সহজেই তিনি ধরতে পারবেন। যেমন ধরুণ চিত্রে কোন স্থানে একটি দেয়ালপঞ্জী দেখানো হয়েছে—চিত্রের কাহিনীটি যে যুগের উক্ত প্রতিষ্ঠান তার বহু পরে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—এরকম ছোট খাটো আরো বড় ত্রুটিও আমাদের চোখে পড়েছে। অথচ এগুলি পরিচালক একটু বেশী চিন্তাশীল হলেই শুধরে নিতে পারতেন। এছাড়া চিত্রের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ঠিক কাহিনী উপযোগী করে তুলতে তিনি যে প্রয়াস পেয়েছেন—অনেকাংশে আবার কৃতকার্যও হয়েছেন। মাদুরা, বৃন্দাবন, কাশী, প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থানগুলির দৃশ্যাবলী প্রদর্শনের আমরা প্রশংসাই করবো।

অভিনয়ে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার শ্যামাকান্তের ভূমিকায় একদিক দিয়ে যেমনি চিত্রখানিকে অভিনয়ের দিক থেকে অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছেন তেমনি কয়েকটী দৃশ্যে তার অভিনয় প্রতিভার এমনি চরম বিকাশ দর্শকেরা দেখতে পারেন—যা এই চিত্রখানির সংগে ভাদুড়ীর অভিনয় প্রতিভার একটি দিক জড়িত হয়ে থাকবে। প্রথমার্ধের অভিনয়ে ভাদুড়ীর অভিনয়ে মন বিষিয়ে উঠবে—দ্বিতীয়ার্ধে একটু একটু এই ভাবটা কমে—দুটো দৃশ্যে—বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটি—যেখানে কোন কথার প্রাবল্য নেই—গতির চাঞ্চল্য নেই—মাত্র কয়েকটি অভিব্যক্তিতে শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী দর্শকদের মন গলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

নবাগত বিমান ব্যানার্জ্জির কাটখোট্টা কথা নবাগত বলেই ক্ষমা করা চলে। শ্রীমতী সাবিত্রীর প্রাণহীন অভিনয় ও চাহনী অসহ্য মনে হবে। চিত্রাও ঠিক তার পাশাপাশি যায়। প্রমোদ গাঙ্গুলী চলনসই। শৈলেন চৌধুরী ও তুলসী চক্রবর্তীর প্রশংসা করবো। প্রভার চরিত্রোপযোগী অভিনয়—নিখুঁত। জহর গাঙ্গুলী নিজের অভিনয় প্রতিভায় তার চরিত্রটী জমিয়ে তুলতে একটুকুও কার্পণ্য করেন নি। বেণুকার অভিনয় মাধুর্যে আমরা তৃপ্ত হয়েছি। তার অভিনয়-প্রতিভা বিকাশের রূপ দিন দিন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। সংগীত মনে কোন দাগ কাটে না। এজন্য সুরশিল্পী দুর্গা সেনের সুরের চেয়ে যাঁদের মুখে গান ফুটে উঠেছে অথবা যাদের মুখ দিয়ে তিনি গান ফুটিয়ে তুলেছেন তাদেরই দায়ী করবো বেশী।

চিত্র ও শব্দগ্রহণ চলনসই। কুমারী সতী রায়

শকুন্তলা ঃ

ভী, শান্তারাম প্রয়োজিত পরিচালিত রাজকমল কলা-মন্দিরের সর্বপ্রথম চিত্র শকুন্তলা প্যারাডাইসে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরিচালকরূপে শান্তারামের নাম-চিত্রামোদীদের কাছে অজানা নেই, শ্রীযুক্ত শান্তারাম ভারতীয় চিত্রজগতে পর পর কয়েকখানি চিত্র উপহার দিয়ে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পর্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। শান্তারামের চিত্রের জন্য দর্শকেরা যে উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় থাকবেন—এতে আর আশ্চর্যের কী থাকতে পারে। প্রভাত ফিল্মের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে শান্তারাম পৃথক ভাবে যে প্রযোজক প্রতিষ্ঠানটী গড়ে তুলেছেন—ভারতীয় চিত্রজগতে তার দাবী নিয়েই শকুন্তলার আত্ম-প্রকাশ। শকুন্তলা চিত্র দেখে সে দাবী কোন চিত্রামোদীই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।

অমর কবি কালিদাসের মানস-প্রতিমা "শকুন্তলা" শান্তারামের দক্ষ পরিচালনা গুণে এবং তার সুযোগ্যা স্ত্রী—প্রিয়দর্শনা অভিনেত্রী শ্রীমতী জয়শ্রীর অভিনয় নৈপুণ্যে—পর্দায় যে রূপ পেয়েছে তার আমরা প্রশংসাই করবো। কালিদাসের 'শকুন্তলা' শুধু সেযুগের নয়—এযুগের ভারতীয় নারীদেরও আদর্শ স্থানীয়। "পতি দিলে না ঠাঁই, পিতার ঘরেও আশ্রয় নিতে পারলে না সে কিন্তু তবু নারী যে অবলা নয় সেই সত্যটী সমগ্র জগৎ সমক্ষে তুলে ধরার জন্য সমস্ত বাঁধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে একান্তই নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থায় স্বীয় চরিত্র বলে, অটল কর্তব্যপরায়ণতায় এবং সর্বমুখী প্রতিভাদীপ্তিতে নিজেকে সে সর্বযুগের বরণীয়া নারীদের অন্যতমা করে তুললো। নারী হয়েও সে ভরতকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা করে তুলেছিল, তাকে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছিল, তাকে শিখিয়েছিল জগতে নিজের শক্তি ও সামর্থের উপর ভর ক'রে দাঁড়াতে পিতার নাম ভাঁড়িয়ে নয়। এই মহিমময়ী তেজস্বিনী নারীর চরিত্র গাঁথা ভারতীয় নারী মাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষন করবে।"

অভিনয়ে শ্রীমতী জয়শ্রী ও চন্দ্রমোহন সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য অভিনয়াংশ উল্লেখযোগ্য না হলেও নিন্দনীয় নয়।

চিত্রে কয়েক স্থানের পরিচালনায় আমরা ব্যথিত হয়েছি—বিশেষ করে যে স্থানের কথা উল্লেখ করছি—মাতা গৌতমীর সামনে—আশ্রম বালিকাদের রসিকতা—কালিদাসের গৌতমীকে অনেক নীচুতে নামিয়াছে।

দৃশ্যাবলীর মর্যাদা যথাসাধ্য রক্ষিত হয়েছে। তবে শকুন্তলা ও আশ্রম বালিকাদের বেশ ভূষায় শান্তারাম নিজের চিন্তাশীলতার যথার্থ পরিচয় দিতে পারেননি।

চিত্রখানি মোটের উপর উপভোগ্য হয়েছে—'Class এবং Mass' দুই শ্রেণীর দর্শকেরাই শকুন্তলা দেখে যে তৃপ্ত হবেন সেকথা নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি এবং আমাদের মনে হয় শ্রীযুক্ত শান্তারাম 'Class এবং Mass' দুইকেই সন্তুষ্ট রাখতে যেয়ে মাঝে মাঝে Classকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। —নিশিকান্ত মজুমদার

হাজরাদী ব্যাঙ্ক লিঃ

দেশকে শিল্পমুখীন করতে হ'লে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা সর্ববাদী সম্মত। আমাদের দেশের ধনীক সম্প্রদায়ের এদিকে আজকাল বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। কয়েক বছরের ভিতর দেশের বুকে বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান গড়ে জাতির শিল্পোন্নতিরই নির্দেশ দিচ্ছে। জাতীয় শিল্পের উন্নতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে হাজরাদী ব্যাঙ্ক প্রায় চোদ্দ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। ব্যাঙ্কের কর্মীদের উৎসাহ এবং প্রচেষ্টায়, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার শ্রীযুত কালীচরণ সেন এবং অন্যতম ডাইরেকটার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার বোসের পরিচালনায় আজ হাজরাদী ব্যাঙ্ক ভারতীয়দের বিশ্বাস আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বে এদের ধর্মতলা শাখার উদ্বোধন হয় জাতীয় মহাসভার ভূতপূর্ব সভানেত্রী ও জনপ্রিয় দেশনেত্রী শ্রীযুক্ত নাইডু এই উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত থেকে কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানান। তাঁর শারীরীক অসুস্থতার জন্য বেশীক্ষণ থাকতে পারেননি। ডাঃ বিধান রায় উদ্বোধন উৎসবে পৌরহিত্য করেন। আমরা হাজরাদী ব্যাঙ্কের সর্ব প্রকার উন্নতি কামনা করি।

বিশিষ্ট সঙ্গীতানুরাগীর পরলোক গমন

চট্টগ্রাম নিবাসী ও চটগ্রাম পি, ডবলিউ ডি'র ভূতপূর্ব কর্মচারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন সেন হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হ'য়ে তার গলফ ক্লাব রোডস্থ বাসা ভবনে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৫৮ বৎসর বয়স হ'য়েছিল। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আমরা মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করি।

অজয় ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফণ্ড (কুমিল্লা)

অজয় ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যু সমস্ত বাংলার হৃদয় ব্যথিত করে তুলেছে। দেশের এই প্রিয় সন্তানের স্মৃতি রক্ষা করা তাঁর গুণ মুগ্ধ সুহৃদয়বর্গের একান্ত কর্তব্য। কুমিল্লায় অজয় ভট্টাচার্যের মূর্তি স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন দাশগুপ্তকে সভাপতি করে একটি মেমোরিয়াল ফাণ্ড খোলা হয়েছে। দেশবাসীর সহৃদয় দানের উপরই বাংলার এই কৃতি সন্তানের স্মৃতি রক্ষা নির্ভর করছে। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা সুকুমার দত্ত, সম্পাদক অজয় ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ফণ্ড, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেনিউ।

অজয় স্মৃতি-সংখ্যা

—যাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করে রূপ-মঞ্চ অজয় স্মৃতিসংখ্যা গৌরবান্বিত—

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, কানন দেবী, পদ্মা দেবী, শচীন দেববর্মা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মধুবসু, সুশীল মজুমদার পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় (ডি, লুক্স) চিত্ত ঘোষ (অরোরা) ভুবনমোহন লাহিড়ী (কোয়ালিটী ফিল্মস) নলিনীরঞ্জন বসু (ভ্যারাইটী পিকচার্স) মনোরঞ্জন ঘোষ (প্রাইমা ফিল্মস), পি, সি, নান (মডার্ণ টকীজ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র (নিউথিয়েটার্স) সুধীরেন্দ্র সান্যাল, সুশীল সিংহ (এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স), নারায়ণ চৌধুরী, প্রবোধ সেন (শান্তি নিকেতন) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কামিনী কুমার রায়, মন্দার মল্লিক (মন্দার ফিল্মস), অমল দত্ত (ডি, লুক্স), ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী, গোপাল ভৌমিক, কালীশ মুখোপাধ্যায়, বীরেন দাশ (ইনফরমেশন অব ইণ্ডিয়া ফিল্মস) শ্রীপার্থিব রবীন্দ্র বিনোদ সিংহ, অজিত সেন (ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও) বিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির উদ্যোগে বিশেষ জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতা

দর্শকের দাবী নিয়ে আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন!

১৯৪৩ সনের শ্রেষ্ঠ চিত্র
" " " পরিচালক
" " " অভিনেতা
" " " অভিনেত্রী
" " " সুরশিল্পী
" " " কাহিনী

১৯৪৩ সনের প্রতিযোগিতার বাংলা চিত্রগুলি :

১। আলেয়া : ২। অভিসার : ৩। কাশীনাথ : ৪। জননী : ৫। জজ সাহেব নাতনী : ৬। দাবী : ৭। দ্বন্দ : ৮। দিক্‌শূল : ৯। দম্পতি : ১০। দেবর ১১। নীলাঙ্গুরীয় : ১২। পরিণীতা : ১৩। পাপের পথে ১৪। প্রিয় বান্ধবী : ১৫। যোগাযোগ : ১৬। সমাধান : ১৭। সহধর্ম্মিণী : ১৮। স্বামীর ঘর : ১৯। শহর থেকে দূরে

আগামী ১৫ই মার্চের ভিতর আপনার অভিমত সম্পাদক বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি, ৩০, গ্রে ষ্ট্রীটে এসে পৌছান চাই।

যে চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন :

ডি, লুক্স পিকচার্স, অরোরা ফিল্ম করপোরেশন, চিত্রবাণী লিঃ, চিত্রভারতী, কোয়লিটী ফিল্মস, ভ্যারাইটী পিকচার্স, ম্যানসাটা ফিল্মস ডিষ্ট্রিবিউটর্স, কাপুর চাঁদ লিমিটেড, এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটর্স লিঃ ইষ্টার্ণ টকিজ।

এঁদের সবাইকে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পূর্ব্বাশা পত্রিকা লিমিটেডের সাহায্য এবং সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সংগে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি :—

মিল থেকে কাগজ পেতে বিলম্ব হওয়ার দরুন এবং চাহিদামত কাগজ না পাওয়াতে রূপ-মঞ্চ সে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে পাঠক পাঠিকারা রূপ-মঞ্চের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে রূপ-মঞ্চ প্রকাশের বিলম্বের জন্য আশা করি ক্ষমা করবেন। অনেকে ঠিকমত কাগজ পান না বলে অভিযোগ জানিয়েছেন—এমতাবস্থায় 'এমাস থেকে আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং'এ আমরা কাগজ পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি—এতেও যদি গ্রাহকেরা ঠিক মত না পান আমরা নিরুপায় এবং এ অবস্থায় রেজিষ্টিযোগে নিতেই অনুরোধ জানাই—

ভুল সংশোধন : শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সরকারের স্থলে তের পৃষ্ঠায় ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্তীকে বাক্লণবাড়িয়া ঈশ্বর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক বলে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

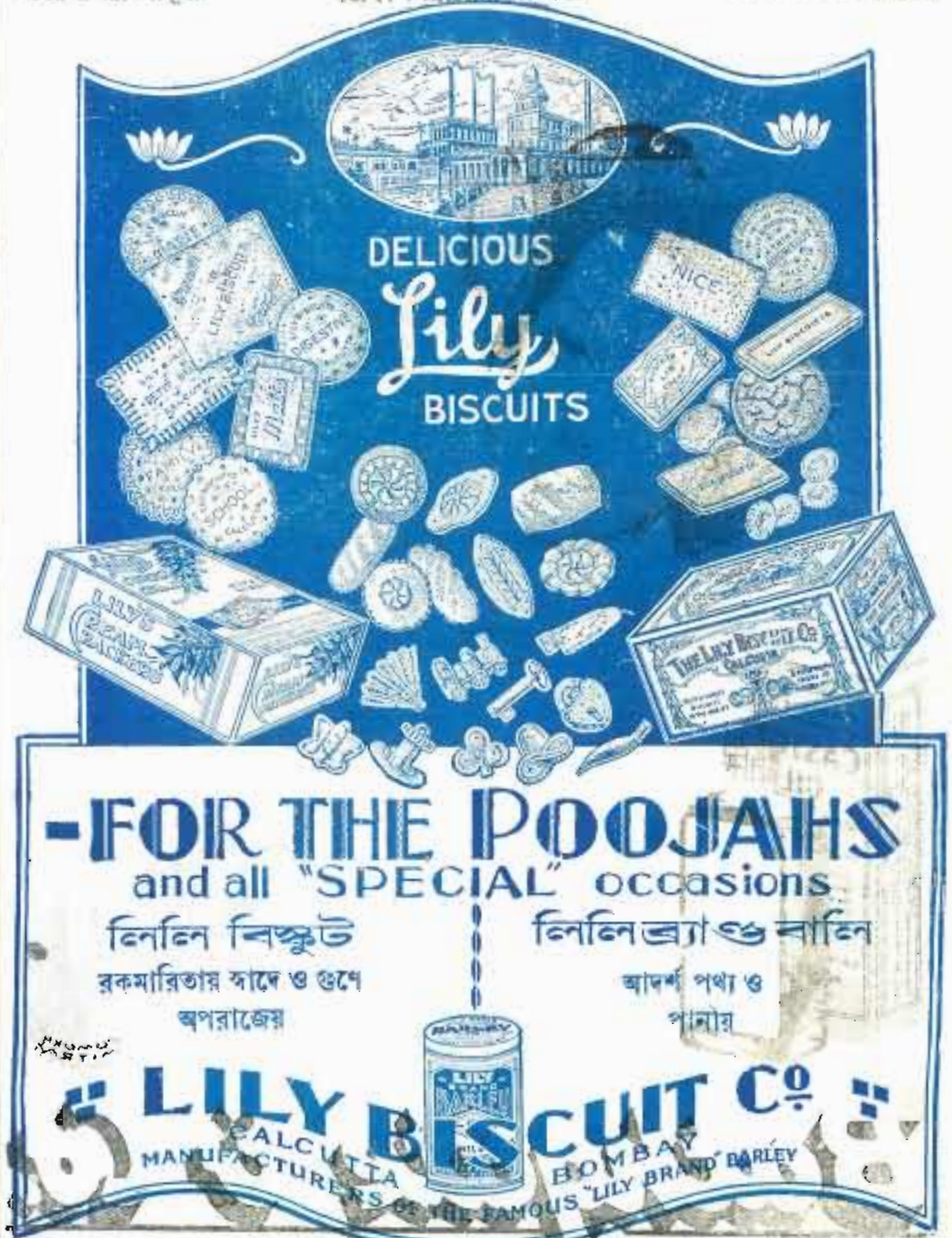

Published by Kalish Mukherjee from 10, Jhamapukur Lane, and Printed by him at the M. I. Press, 30, Grey Street, Cal.

Bathgate & Co

CHEMISTS CALCUTTA

মূল্য : প্রতি সংখ্যা : আট আনা